গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৬৮ বর্ষ ১৩ সংখ্যা ৬ - ১২ নভেম্বর ২০১৫ প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর www.ganadabi.in আট পাতা মূল্য ঃ ২ টাকা

আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকেই স্কুল শিক্ষায় পাশ-ফেল চালু করতে হবে

২৬ আগস্ট, ২০১৫। কলকাতা

বহু বছরের বহু লড়াই আন্দোলনের পরিণামে — বিভিন্ন রাজ্যের বধির সরকারি কর্তাদের অবশেষে এই সত্য শোনানো গিয়েছে যে, অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষায় পাশ-ফেল ব্যবস্থা তুলে দেওয়ার ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষায় মারাত্মক ক্ষতি করা হয়েছে, নিম্নমধ্যবিত্ত ও প্রধানত গরিব ঘরের ছেলে-মেয়ে — যারা ব্যয়বহুল বেসরকারি স্কুলে শিক্ষা পাওয়ার সুযোগের কথা ভাবতেই পারে না — তাদের বুনিয়াদি শিক্ষা পাওয়ার স্তরেই নেমে এসেছে ভয়াবহ অন্ধকার।

পশ্চিমবঙ্গ সহ দেশের একদল পণ্ডিত রায় দিয়েছিলেন, স্কুলছুটের সংখ্যা বাড়ছে পরীক্ষায় ফেল করার ভয়ে। পাশ-ফেল তুলে দেওয়ার পরও তা যখন কমল না, পণ্ডিতরা বুঝলেন, গরিবিই স্কুলছুটের কারণ। অতএব স্কুলে বিনামূল্যে দুপুরে খাবার দাও, ছাত্র-ছাত্রী আসবে। চালু হল মিড-ডে মিল। স্কুলে হাজিরা দিলেই দুপুরে খাদ্য পাওয়া যাবে। দেখা গেল স্কুলে যাওয়ার জন্য ছাত্রদের ও অভিভাবকদের আগ্রহ কেবল দুপুরের খাবারটুকুর জন্য। পাশ-ফেল হীন শিক্ষা ব্যবস্থায় পড়া হল কী হল না, কী পড়া হল, ছাত্ররা কী শিখল, শিক্ষকরা কীরকম শেখাচ্ছেন ইত্যাদি জানার ও তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার দায় কারও নেই— ছাত্র, শিক্ষক অভিভাবক কারওরই নয়। ফল যা হওয়ার সেটাই হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে কয়েক প্রজন্মের ছাত্র-ছাত্রীরা যেমন ইংরেজি ভাষা ন্যূনতম শেখেনি যার ফলে উচ্চ শ্রেণিতে যেখানে আজও ইংরেজিতেই পাঠ নিতে পরীক্ষা দিতে হয়, সেখানে ব্যর্থ হয়ে চলেছে, তেমনই পাশ-ফেল হীন পড়াশুনায় শিক্ষার বুনিয়াদ বলতে কিছুই গড়ে ওঠেনি।

অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল তুলে দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করল উপযুক্ত বয়স থাকলে কোনও পূর্বশিক্ষাহীন ব্যক্তিকেও তার পছন্দের শ্রেণিতে ভরতি করে নিতে হবে। সরকার দাবি করল, এসবের দ্বারা শিক্ষার প্রসার নাকি ঘটবে দ্রুত ও ব্যাপক হারে। কিন্তু দ্রুত ও ব্যাপক হারে বাস্তবে যা ঘটল, তা শিক্ষার অধোগমন, যেটা অনিবার্যই ছিল। শুধু পাশ-ফেল না থাকার জন্যই এই অবনতি, তা নয়, অবনতির কারণ আরও আছে, যার মধ্যে পাশ-ফেল ব্যবস্থা না থাকাটা অত্যন্ত গুরুতর কারণ। পাঠ্য

দুয়ের পাতায় দেখুন

মহান নভেম্বর বিপ্লব স্মরণে

এ বছর ৭-১৭ নভেম্বর উদযাপিত হতে চলেছে রাশিয়ার মহান নভেম্বর বিপ্লবের ৯৮তম বার্ষিকী, যে বিপ্লবে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন মহান লেনিন। এ কথা সকলেরই জানা আছে, মানবসমাজের ইতিহাসে এটাই ছিল প্রথম সফল সর্বহারা বিপ্লব ক্রমান্বয়ে সমস্ত ধরনের ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও শ্রেণিগুলির বিলুপ্তি ঘটিয়ে সাম্যবাদী সমাজ গঠনের দিকে পদক্ষেপ করার লক্ষ্য নিয়ে যে যাত্রা শুরু করেছিল। মহান লেনিনের অকালমৃত্যুর পর তাঁর সুযোগ্য শিষ্য মহান স্ট্যালিন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সংহত ও শক্তিশালী করেছিলেন। এই কাজে বাইরের কোনও দেশের সাহায্য পাওয়া দূরের কথা বরং শত্রু সোভিয়েট সমাজতন্ত্রকে চারদিক ঘিরে ধ্বংস করার চেষ্টা চালায় পুঁজিবাদী দেশগুলি। এই প্রতিকূল পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে কমরেড স্ট্যালিন বহিঃশত্রুর আগ্রাসন এবং দেশের অভ্যন্তরে প্রতিবিপ্লবী ষড়যন্ত্রগুলির মোকাবিলা করেছেন, তাদের পরাস্ত করেছেন। পাশাপাশি উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশগুলির সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মুক্তিসংগ্রামে প্রেরণা ও সাহায্য দিয়েছেন, বিশ্ব জুড়ে কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিকাশ ঘটিয়েছেন এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্যাসিস্ট জার্মানির নেতৃত্বাধীন দুর্ধর্ষ অক্ষশক্তিকে পরাজিত

ছয়ের পাতায় দেখুন

বিজেপির দুষ্ট রাজনীতি ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করছে

বিজেপি-সংঘ পরিবারের দৌলতে দেশ জুড়ে ক্রমবর্ধমান সাম্প্রদায়িক বৈরিতা, অসহিষ্ণুতার বিরুদ্ধে সরকারের নীরবতাকে ধিক্কার জানিয়ে এ পর্যন্ত ৪১ জন সাহিত্য অ্যাকাডেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত কবি-সাহিত্যিক তাঁদের পুরস্কার ফিরিয়ে দিয়েছেন। পি এম ভার্গবের মতো জৈব রসায়নের প্রখ্যাত বিজ্ঞানী তাঁর পদ্মভূষণ খেতাব ত্যাগ করে বলেছেন, সরকার ধর্মাশ্রয়ী স্বৈরতন্ত্রের পথে বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিবাদী দৃষ্টিকে আক্রমণ করছে। রোমিলা থাপার, ইরফান হাবিবের মতো ৫৩ জন প্রথম সারির ইতিহাসবিদ প্রতিবাদপত্র পাঠিয়েছেন রাষ্ট্রপতির কাছে। দিবাকর বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দ পট্টবর্ধনের মতো বিশিষ্ট চিত্র পরিচালক সহ সিনেমার সাথে যুক্ত বহু জন তাঁদের সরকারি খেতাব ফিরিয়ে দিয়েছেন পুণে ফিল্ম ইনস্টিটিউট সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে বিজেপি-সংঘ পরিবারের কুক্ষিগত করার চেষ্টার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে। ১০৭ জন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ভারতীয় বিজ্ঞানী এই নিয়ে প্রতিবাদ জানিয়ে রাষ্ট্রপতিকে চিঠি দিয়েছেন। তবুও সক্রিয় হওয়া দূরস্থান, প্রধানমন্ত্রীর সহকর্মী অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি প্রতিবাদীদের আক্রমণ করে বলেছেন, এসব সাজানো প্রতিবাদ। এর পিছনে রাজনীতি রয়েছে। এঁরা কট্টর বিজেপি বিরোধী বলেই এ সব কথা বলছেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং প্রশ্ন তুলেছেন, কংগ্রেস আমলে এঁরা কোথায় ছিলেন? বিজেপি মুখপাত্র এন রাওয়ের মন্তব্য, বিজ্ঞানী ভার্গবের 'প্রতিবাদের ব্যারাম আছে'। বিজেপি নেত্রী উমা ভারতী আরও নিচে নেমেছেন। তাঁর ভাষায়— যাঁরা প্রতিবাদ করছেন তাঁরা সব পাকিস্তানি সন্ত্রাসবাদীদের মদতদাতা। বিজেপি নেতা-নেত্রীদের এইসব প্রতিক্রিয়ার মধ্যে প্রতিবাদীদের উত্থাপিত প্রশ্নের একবিন্দু জবাবও নেই। প্রশ্ন যাঁরা তুলেছেন, প্রতিবাদ যাঁরা করছেন তাঁরা কোথায় ভুল, আর বিজেপি কোথায় ঠিক, তার কোনও ব্যাখ্যা নেই। শুধু আছে কটূক্তি ও কুৎসিত ভাষা, যা যুক্তি হারালেই মানুষ করে থাকে। এঁদের কুৎসিত ভাষাই বলে দেয় দেশের শাসনভার এখন লুম্পেন রাজনীতিকদের হস্তগত। অবশ্য এ কথা তো ১৯৯২ সালে বাবরি মসজিদ ধ্বংসের সময়েই প্রমাণ হয়েছিল। ভারতীয় ঐতিহ্যের এই

১৭ অক্টোবর। অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসের সামনে বুদ্ধিজীবীদের প্রতিবাদ সভা

দুয়ের পাতায় দেখুন

উত্তরবঙ্গের চা-শ্রমিক এবং বর্ধমানে চাষিমৃত্যুর ঘটনা উদ্বেগজনক

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক সৌমেন বসু ৩১ অক্টোবর এক বিবৃতিতে বলেন,

"উত্তরবঙ্গের বন্ধ চা-বাগানগুলিতে পরপর অনাহারে শ্রমিকদের মৃত্যু ঘটছে। অথচ রাজ্য সরকার এব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন। আমরা এর তীব্র নিন্দা করছি এবং সমস্ত বন্ধ চা-বাগানগুলি অধিগ্রহণ করে শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নিশ্চিত করার এবং মৃত শ্রমিকদের পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবি জানাচ্ছি।

অন্য দিকে সেচের অভাবে ফসল নষ্ট

পাঁচের পাতায় দেখুন

বিজেপির দুষ্ট রাজনীতি

একের পাতার পর

স্বঘোষিত অভিভাবকদের কীর্তিকলাপের শেষ নেই। প্রখ্যাত গজল গায়ক গুলাম আলি পাকিস্তানের নাগরিক বলেই তাঁকে ভারতে গান গাইতে দেওয়া হল না। পাকিস্তানের প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রীর বই কেন এখানে প্রকাশ করা হবে, এই অভিযোগ তুলে প্রকাশ্যে মুখে কালি লেপে দেওয়া হল এক সংগঠকের। বাড়িতে গোমাংস রাখা আছে এই গুজব ছড়িয়ে দিল্লির উপকণ্ঠে দাদরিতে বিজেপি বিধায়কের নেতৃত্বে মহম্মদ আখলাককে তাঁর পরিবারের সামনে পিটিয়ে হত্যা করা হল। দিল্লির কেরালা ভবনের ক্যান্টিনে গোমাংস বিক্রি হচ্ছে, এই অভিযোগে পুলিশ পাঠানো হল। আরও ভয়ঙ্কর হল, কর্ণাটকের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এম এম কালবার্গির হত্যা, মহারাষ্ট্রে যুক্তিবাদী নরেন্দ্র দাভোলকর এবং গোবিন্দ পানসারের হত্যাকাণ্ড। কোথাওই অপরাধীরা এখন পর্যন্ত ধরা পড়ল না। ঠিক যেমনটি ঘটছে প্রতিবেশী বাংলাদেশে। ওখানে মুসলিম মৌলবাদীরা যেভাবে ধর্মনিরপেক্ষ সাহিত্যিক-প্রবন্ধকারদের প্রকাশ্যে হত্যা করছে, সরকার নীরব-নিষ্ক্রিয় থাকছে, ভারতেও তাই ঘটছে। আসলে ধর্মান্ধতা ও মৌলবাদের মধ্যে খারাপ বা ভালো বলে তো কিছু হয় না। পাকিস্তান-বাংলাদেশ থেকে আরব-মধ্যপ্রাচ্য-ইজরায়েল এবং ভারত, সব দেশের দৃষ্টান্তই দেখাচ্ছে সর্ব ধর্মের মৌলবাদীদের জাত এক, চরিত্র এক। এই অবস্থায় বিজেপি সভাপতি অমিত শাহ যখন বিহারে গিয়ে বলেন, বিহারের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি হারলে পাকিস্তানে বাজি ফাটানো হবে, তখন তাঁকে এই ভবিষ্যদ্বাণীর জন্য বাহবা দিতেই হয়। পাকিস্তানের মুসলিম মৌলবাদীদের সঙ্গে ভারতের হিন্দু মৌলবাদীদের গভীর সখ্যতা। মুম্বই হামলায় অভিযুক্ত সন্ত্রাসবাদী পাকিস্তানের হাফিজ সঈদের সঙ্গে পাকিস্তানে গিয়ে দেখা করেছিলেন ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক বলে পরিচিত আর এস এস ঘনিষ্ঠ বেদ প্রকাশ বৈদিক। এ নিয়ে খুব সামান্য হইচই হয়েছিল, কিন্তু আলোচনা কী হয়েছিল তা প্রকাশ করা হয়নি। হতে পারে অমিত শাহরা বলে পাঠিয়েছিলেন, হিন্দুত্ববাদীরা এ দেশে সমস্যায় পড়লে তোমরা মুসলিম মৌলবাদীরা আমাদের সাহায্য কোরো। আসলে তো আমরা ভাই-ভাই। এবার বিহার নির্বাচনের পর অমিত শাহরা সেই সাহায্য চেয়ে বলতেই পারেন, তোমরা পাকিস্তানে বাজি পোড়াও, আমাদের এখানে হিন্দুত্ববাদকে চাগাতে সুবিধা হবে।

এত কিছু করেও বিহার ভোটের পর্বে সাম্প্রদায়িক বিভাজন যেন ঠিক হচ্ছে না, এমনটা অনুভব করেই বিজেপি তাদের ঝুড়ি থেকে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির পুরনো মরচে পড়া অস্ত্রটিকেই বের করে সাম্প্রদায়িক বিষ ছড়াবার আবার চেষ্টা করছে। এই মতলব থেকেই গত আগস্ট মাসে কেন্দ্রের মোদি সরকার 'ধর্মভিত্তিক জনশুমারির ফলাফল' প্রকাশ করে। ওই গণনায় আছে যে, গত ১০ বছরে ভারতে হিন্দুদের তুলনায় মুসলিম জনসংখ্যার অনুপাত ০.৮ শতাংশ-বিন্দু বেশি। আর কিছু দরকার নেই, শুধু এটুকু সংবাদ ছড়িয়ে দিতে পারলেই মুসলমানেরা ভারতবর্ষ দখল করে নেবে এই আতঙ্ক এক বিরাট অংশের হিন্দু জনগোষ্ঠীকে তাড়া করে বিজেপি-র ভোটবাক্সে টেনে আনবে। এই হচ্ছে অঙ্ক।

এই অঙ্কের মিথ্যাচার ফাঁস করে দিয়ে সংবাদপত্রে প্রকাশিত একটি বিবাদ থেকে দু-চারটি লাইন তুলে দেওয়া যাক। "মুসলমানদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নিয়ে প্রচার চালানোর সময় হিন্দু নেতারা মুসলমানদের চারটে বিয়ের কথা বলবেন, অনুপ্রবেশের প্রসঙ্গ টানবেন, এমনকী সংখ্যা বাড়িয়ে হিন্দুদের উপরে যাওয়ার ষড়যন্ত্র তত্ত্বেরও অবতারণা করবেন, কিন্তু ভুলেও কখনও এ কথা বলবেন না যে, প্রাচীন ভারতে কখনও মুসলমান জনসংখ্যা এত কম হারে বাড়েনি। ১৯৯১ থেকে ২০০১ সালের দশক অবধিও মুসলমান জনসংখ্যার দশসালা বৃদ্ধির হার ছিল ৩০ শতাংশের কাছাকাছি। তার পরের দশকে সেই হার নেমে এসেছে ২৪.৬ শতাংশে। তাঁরা বলবেন না আলোচ্য দশকে হিন্দুদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার যতখানি কমেছে, মুসলমানদের হার কমেছে তার চেয়ে ঢের বেশি।" (অমিতাভ গুপ্ত, আনন্দবাজার পত্রিকা, ২১.৮.১৫)। কিন্তু যে মূল প্রশ্নটির জবাব মোদি-অমিতেরা দেবেন না, তা হল, স্বাধীনতার ৬৭ বছর পরেও কেন মুসলমান সাধারণ মানুষ বঞ্চনা ও অনুন্নয়নের নিম্নতম স্তরে রয়ে গেল? কংগ্রেসেরও এই দায় ছিল না। তারাও মুখে 'সংখ্যালঘু ত্রাতা' সেজে মুসলিম ভোট ব্যাঙ্কের দুষ্ট রাজনীতি করেছে। এখন বিজেপি সংখ্যাগুরু হিন্দু জনগণের ত্রাতা সেজে মিথ্যাচার আর ধোঁকাবাজিতে ভুলিয়ে হিন্দু ভোট ব্যাঙ্ক তৈরি করতে চাইছে। বোঝা যায়, কংগ্রেস বিজেপি বা অন্য সব বুর্জোয়া দলই আজ কতটা দেউলিয়া।

তবে একটি সতর্কতা না জারি করলেই নয়। নির্বাচনী ফলাফল কী হবে তা ভবিষ্যতই বলবে। কিন্তু কেউ যদি মনে করেন, বিজেপি পরাস্ত হলে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ধুয়ে মুছে যাবে তবে বিরাট ভুল হবে। যে বিষ তারা মাটিতে বাতাসে মিশিয়ে দিয়েছে তা থাকবেই। ফলে প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষতার বামপন্থী রাজনীতিকে হাতিয়ার করে সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদের বিরুদ্ধে আদর্শগত সংগ্রামকে শিথিল করা আত্মহত্যার সামিল হবে। পাশাপাশি দেশে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বাতাবরণ তৈরি করার দ্বারাই একমাত্র এই সাম্প্রদায়িকতাকে প্রতিহত করা সম্ভব।

পাশ-ফেল চালু করতে হবে

একের পাতার পর

সিলেবাস, স্কুলের পরিকাঠামো, শিক্ষণ পদ্ধতি ইত্যাদি বহু প্রশ্ন আছে। কিন্তু পাশ-ফেল ব্যবস্থা না থাকলে, স্কুলে ও বাড়িতে লেখাপড়া নিয়ে শেখার আগ্রহই তো চলে যায়। পরীক্ষা দিয়ে পাশ না করলে পরবর্তী শ্রেণিতে প্রোমোশন হবে না, একই শ্রেণিতে থেকে যেতে হবে—এই নিয়ম থেকে পড়বার, ভালো করে পড়া তৈরি করার, সঠিক উত্তর লিখতে পারার যে তাগিদ ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের মধ্যে স্বাভাবিক ভাবে দেখা দেয়, তার সবই অকার্যকারী ও অবাঞ্ছনীয় হয়ে যায় পরীক্ষা না থাকলে, পরীক্ষায় পাশ করার তাগিদ না থাকলে। ভালোমন্দ নিয়ে ভাবাই অবান্তর হয়ে যায়।

১৯৭৭ সালে ক্ষমতায় বসার কয়েক বছরের মধ্যেই সিপিএম ফ্রন্ট সরকার যখন প্রাথমিকে ইংরেজি ভাষা শিক্ষা ও চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত পরীক্ষা তুলে দেয়, তখন একমাত্র রাজনৈতিক দল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) তার বিরুদ্ধতা করে এর পরিণাম প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে তো বটেই, মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও অত্যন্ত ক্ষতিকর হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছিল, ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকদের সতর্ক করেছিল। কিন্তু সরকার যথারীতি শোনেনি।

এরপর শুরু হয়েছিল এক দীর্ঘ ঐতিহাসিক ভাষা-শিক্ষা আন্দোলন যা শিখরে পৌঁছেছিল ১৯৯৮ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি সর্বাত্মক বাংলা বনধে। ঐ আন্দোলনে পশ্চিমবাংলার শহর-গ্রাম-গঞ্জে ছড়িয়ে পড়েছিল, ঘরে ঘরে উচ্চারিত হয়েছিল ইংরেজি ও পাশ-ফেল ফেরানোর দাবি। সরকার ঐ দাবির প্রতি কর্ণপাত তো করেইনি, উল্টে যেসব বরেণ্য শিক্ষাবিদ-সাহিত্যিকরা ঐ আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাঁদের গালমন্দ করেছিল সরকারি দলের কর্তারা। সরকারি নীতির সমর্থকরা কত যে ভারী ভারী 'তত্ত্ব' ও 'তথ্য' হাজির করে প্রাথমিকে ইংরেজি ভাষা শিক্ষা বিসর্জন দেওয়ার পক্ষে সওয়াল করেছিলেন, তার ইয়ত্তা নেই। ঐসব তত্ত্ব ও তথ্যকে একটি একটি করে খণ্ডন করে তীব্র মতাদর্শগত আন্দোলন পরিচালনা করেছিল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)। যথার্থ মার্কসবাদী দল বলেই এস ইউ সি আই (সি) ওই শিক্ষানীতির সর্বনাশা চরিত্র ধরতে পেরেছিল, আন্দোলন গড়ে তুলেছিল, যেখানে ব্যর্থ হয়েছিল অন্যান্য বুলি সর্বস্ব মার্কসবাদী দলগুলি। কংগ্রেস-বিজেপি-তৃণমূল কংগ্রেসের মতো বুর্জোয়া দলগুলিও সেদিন ওই সর্বনাশা ভাষা শিক্ষানীতিকে সমর্থন করেছিল। ২০০১ সালে সিপিএম ফ্রন্ট সরকার আন্দোলনের কাছে নতিস্বীকার করতে বাধ্য হয়। কিন্তু ইংরেজি ভাষা শিক্ষা ফেরানো গেলেও, পাশ-ফেল ফেরানো যায়নি। ইতিমধ্যে ১৯৯২ সালে বেসরকারিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদ, যারা চতুর্থ শ্রেণির শেষে রাজ্যের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য প্রতি বছর বৃত্তি পরীক্ষার ব্যবস্থা আজও করে যাচ্ছে, যার সবটাই বহুমানুষের সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাশ্রমে। এও শিক্ষা আন্দোলনে এক অনন্য ঘটনা, যার অন্য নজির আছে বলে জানা নেই।

অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল তুলে দেওয়ার ফরমান জারি করে কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার ২০০৯ সালে। পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস সরকারে বসেছে ২০১১ সালে। তারা এ নিয়ে কোনও বিতর্ক ও মত বিনিময় না করেই ২০১২ সাল থেকে এ রাজ্যে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল তুলে দেয়। তারা যদি যথার্থই এর বিরোধী হত, শিক্ষা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করত, তবে তো এ প্রশ্নে কেন্দ্রের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করাই তাদের দায়িত্ব ছিল। শিক্ষা সংবিধানের যুগ্ম তালিকায়, তৃণমূল সরকার চাইলেই এ রাজ্যে কেন্দ্রীয় ফরমান চালু না করতেই পারত। শুধু তাই নয়, পাশ-ফেল চালু করার দাবিতে গত ৩ বছরে তৃণমূল সরকারের কাছে দাবি পেশ করা হয়েছে বহুবার, আন্দোলন-বিক্ষোভ-অবরোধ, গণস্বাক্ষর সংগ্রহ প্রভৃতি গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সকল পদ্ধতিই অনুসরণ করা হয়েছে। সরকার জবাব দিয়েছে পুলিশের লাঠি দিয়ে। তা হলে এই সরকার এতদিন পর কেন্দ্রীয় সরকারকে চিঠি পাঠিয়ে জনমত মেনে নেওয়ার যে ভাব দেখাচ্ছে, সেটা আসলে ভান। সরকার আন্তরিক হলে এখনই এ রাজ্যে পাশ-ফেল পুনরায় চালু করত। তাই আন্দোলন থামবে না, জনগণও নীরব থাকতে পারে না। আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকেই প্রথম শ্রেণি থেকে পাশ-ফেল চালু করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা না করা পর্যন্ত আন্দোলন চলবে।

জীবনাবসান

এস ইউ সি আই(কমিউনিস্ট) কলকাতা জেলার অন্তর্গত সল্ট লেক আঞ্চলিক কমিটির প্রবীণ সদস্য কমরেড মনিকা হোড় স্বল্পদিন রোগভোগের পর আকস্মিকভাবে ২১ অক্টোবর ক্যালকাটা হার্ট ক্লিনিক অ্যান্ড হসপিটালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বছর।

তাঁর মৃত্যুসংবাদ পেয়েই অঞ্চলের কর্মীরা ও পার্টির নেতারা হাসপাতালে যান। কমরেড মনিকা হোড়ের বিপ্লবী জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে মরদেহে মাল্যদান করেন পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড রণজিৎ ধর, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড ছায়া মুখার্জী ও কমরেড শঙ্কর সাহা, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড তপন রায়চৌধুরী। কলকাতা জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড চিররঞ্জন চক্রবর্তীর পক্ষে মাল্যদান করেন জেলা কমিটির সদস্য কমরেড অজয় চ্যাটার্জী। আঞ্চলিক সম্পাদক কমরেড শ্যামল দত্ত ও অন্য আরও অনেকে শ্রদ্ধা জানান। হাসপাতাল থেকে মরদেহ দলের অফিস ৪৮ লেনিন সরণিতে নিয়ে যাওয়া হয়। রাজ্যদপ্তরের পক্ষে মাল্যদান করেন কমরেড গোরা গুপ্ত, সেখান থেকে সল্টলেকে নিজ বাসভবনে মরদেহ পৌঁছলে এলাকার ও প্রতিবেশী মানুষজন অশ্রুসিক্ত চোখে সমবেত হন ও বিদায় জানান। কেওড়াতলা শ্মশানমুখী যাত্রা সল্ট লেকে পার্টির কমিউনের সামনে থামে। পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড মানিক মুখার্জী ও কমরেড অসিত ভট্টাচার্য মাল্যদান করেন। শ্মশানে উপস্থিত কমরেডরা আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে প্রয়াত কমরেডকে শেষ বিদায় জানান।

'৭০-এর দশকে দমদমের কাজিপাড়া ও বটতলায় থাকার সময় দলের নেতা-কর্মীদের নিত্য যাতায়াত ও সাহচর্যই কমরেড মনিকা হোড়কে দলের বৈপ্লবিক আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট করে ও তিনি ধীরে ধীরে দলের একজন নিয়মিত কর্মীতে পরিণত হন। নিজে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী হলেও, তাঁর চাকরি বা পরিবার-সন্তান বা ব্যক্তিগত কাজ কোনও দিনই দলের দায়িত্ব পালনে বাধা হতে পারেনি। ১৯৯২ সালে সল্ট লেকে স্থায়ী বাসভবনে আসার পরও তাঁর কর্মধারায় কোনও ছেদ ঘটেনি। এলাকায় দায়িত্ব পালন করার পাশাপাশি মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের রাজ্য কমিটির কোষাধ্যক্ষের গুরুদায়িত্বও তিনি নিষ্ঠার সাথে নীরবে পালন করেছেন। তাঁর বাড়ি ছিল পার্টির কর্মীদের জন্য সদা উন্মুক্ত। তাই শুধু নয়, বস্তুত, সল্টলেকে দলের সকল কার্যকলাপ, শিক্ষা ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলনেরও প্রাণকেন্দ্র ছিল তাঁর বাড়ি। প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদ, সল্টলেক বুদ্ধিজীবী মঞ্চ সবেরই মূল অফিস কার্যত তাঁর বাড়িতেই ছিল।

শারীরিক অসুস্থতাও তাঁকে দলের কাজ থেকে নিরস্ত করতে পারেনি। দলের কোনও কর্মসূচি থাকলে, শরীর বা বয়স, রোদ-জল কোনও কিছুর বাধা তিনি মানতেন না। তাঁর কাঁধের ব্যাগে সর্বদা দলের কাগজ বই, ছোটদের জন্য বিস্কুট ও অন্যান্য খাবার থাকত। নিজের অসুবিধায় ভ্রুক্ষেপ না করে তিনি অন্যদের সুবিধা-অসুবিধা ও শরীর-স্বাস্থ্যের খোঁজ রাখতেন। তাঁর শান্ত-স্নিগ্ধ স্বভাব, কোমল মৃদু স্বর ও স্নেহমাখা হাসি অপরকে সহজেই কাছে টেনে নিত। পাড়া-পড়শিরাও ছিলেন তাঁর গুণমুগ্ধ।

১ নভেম্বর সল্ট লেকের বি ডি ব্লক মঞ্চে কমরেড মনিকা হোড় স্মরণে চার শতাধিক মানুষের উপস্থিতিতে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন কমরেড চিররঞ্জন চক্রবর্তী। স্মৃতিচারণার মধ্য দিয়ে শ্রদ্ধা জানান কমরেড ছায়া মুখার্জী ও কমরেড তপন রায়চৌধুরী।

কমরেড মনিকা হোড় লাল সেলাম

নয়া জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি স্বাস্থ্যব্যবসায়ীদের স্বার্থেই

কেন্দ্রের বিজেপি সরকার জাতীয় স্বাস্থ্যনীতির ২০১৫ খসড়া প্রস্তুত করে মতামত সংগ্রহের জন্য ওয়েবসাইটে প্রকাশ করেছে। স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতন ব্যক্তি ও সংগঠনগুলি থেকে এই স্বাস্থ্যনীতি সম্পর্কে মত বা সমালোচনা গ্রহণ করার সময়সীমাও শেষ হয়ে গেছে গত মার্চ মাসে। অচিরেই হয়তো চূড়ান্ত জাতীয় স্বাস্থ্যনীতির রূপ দেখা যাবে। কিন্তু কেন এই স্বাস্থ্য নীতি? কাদের স্বার্থে তা প্রণয়নের তোড়জোর? কেন্দ্রীয় সরকারের তো একটা স্বাস্থ্য নীতি ছিলই। তা হলে কেন বারবার স্বাস্থ্যনীতিকে নতুন ঢং-এ আনা হচ্ছে? কী তার উদ্দেশ্য?

১৯৮৩ সালে কংগ্রেস সরকার প্রথম জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি এবং ২০০২ সালে এনডিএ সরকার দ্বিতীয় জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি তৈরি করে। ১৩ বছর আগের নিজেদের তৈরি স্বাস্থ্যনীতিতে মোদিজির সুবিধা হচ্ছে না কেন? আসলে যত দিন যাচ্ছে, পুঁজির মালিকরা, শিল্পপতিরা ততো বেশি করে আর্থিক মন্দা এবং বাজার সংকটে নিমজ্জিত হচ্ছে। বিশ্ব পুঁজিবাদী অর্থনীতির এই দুর্দিনে যতটুকু পুঁজি নিয়োগ হচ্ছে তা বিভিন্ন পরিষেবা ক্ষেত্রে এবং রিয়েল এস্টেটে অর্থাৎ জমি-বাড়ির ব্যবসায়। খসড়া জাতীয় স্বাস্থ্যনীতির শুরুতেই সরকার বলেছে, বিগত দেড় দশকে স্বাস্থ্য-পরিষেবা শিল্প (হেলথ কেয়ার ইন্ড্রাস্ট্রি) ১৫ শতাংশ হারে বেড়েছে। স্বাস্থ্য-পরিষেবা ক্ষেত্রের এই বৃদ্ধি অন্যান্য পরিষেবা ক্ষেত্রের বৃদ্ধির দ্বিগুণ এবং জাতীয় আর্থিক বৃদ্ধির তিন গুণ। সুতরাং শিল্পপতিরা এবং পুঁজির মালিকরা যখন অন্যান্য ক্ষেত্রে বাজার সংকটে ধুঁকছে তখন তারা স্বাস্থ্য-পরিষেবা ক্ষেত্রে ব্যবসা করতে অগ্রসর হবে এবং পুঁজি বিনিয়োগ করবে, তাতে আর আশ্চর্য কি?

স্বাস্থ্যনীতির খসড়ায় হেলথ কেয়ার ইন্ড্রাস্ট্রি ২.১২ পরিচ্ছেদে খোলাখুলি বলা হয়েছে, স্বাস্থ্য-পরিষেবা ব্যবসায় বিনিয়োগ এবং বৃদ্ধিকে সাহায্য করা সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ গৃহীত নীতি। বর্তমানে দেশে প্রাইভেট স্বাস্থ্য-পরিষেবা ব্যবসার পরিমাণ ২ লক্ষ ৬৮ হাজার কোটি টাকা এবং ২০২০ সাল নাগাদ ভারতে তা পৌঁছবে আনুমানিক ১৮ লক্ষ ৭৬ হাজার কোটি টাকায়। বর্তমান দশকে স্বাস্থ্য পরিষেবা শিল্পের ১৪ শতাংশ আর্থিক বৃদ্ধি আগামী দশকে বৃদ্ধিতে ২১ শতাংশ ছুঁয়ে ফেলবে বলে ধারণা। স্বাস্থ্য-পরিষেবা ক্ষেত্রের এই বাণিজ্য এবং মুনাফা চারটি প্রধান ক্ষেত্র থেকে আসে। ক) বিমা ক্ষেত্র এবং যন্ত্রপাতিতে ১৫ শতাংশ, খ) ওষুধপত্রে ২৫ শতাংশ, গ) পরীক্ষা-নিরীক্ষা ক্ষেত্রে ১০ শতাংশ এবং ঘ) হাসপাতাল ও ক্লিনিক পরিষেবায় ৫০ শতাংশ। খসড়া নীতিতে সরকার কবুল করেছে গত ২৫ বছর ধরে স্বাস্থ্য-পরিষেবা ব্যবসা বৃদ্ধির অনুকূলে সরকার আর্থিক নীতি অনুসরণ করে চলেছে, যার মধ্যে আছে প্রত্যক্ষ কর হ্রাস। মেডিক্যাল যন্ত্রপাতির ডেপ্রিসিয়েশন বাড়ানো, গ্রামীণ হাসপাতালে ৫ বছর ইনকাম ট্যাক্স ছাড়, জীবনদায়ী যন্ত্রপাতি আমদানি করার ক্ষেত্রে কাস্টম ডিউটি ছাড়, স্বাস্থ্য বিমায় টাকা বিনিয়োগে ট্যাক্স ছাড়, স্বাস্থ্য বিমায় সরকারি টাকা ঢালা— যার মাধ্যমে ২৭ শতাংশ জনগণকে বিমাভুক্ত করা হয়েছে বলে সরকার দাবি করছে। হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য পছন্দসই জায়গায় সস্তায় জমি অধিগ্রহণ করে দেওয়া হয়েছে। সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্বল্প খরচে ডাক্তার, নার্স, প্যারামেডিক্যাল স্বাস্থ্যকর্মী যারা তৈরি হয়েছে, তাদেরও এক বড় অংশ প্রাইভেট সংস্থাগুলিতে গিয়ে কাজ করে।

তা ছাড়া ১০০ শতাংশ এফ ডি আই-এর অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। মার্কেট সূত্র বলছে, ২০১২-'১৩ সালে ভারতে প্রাইভেট স্বাস্থ্য পরিষেবা ক্ষেত্রে ২ বিলিয়ন ডলার এফ ডি আই এসেছে। বিশ্বব্যাঙ্কের প্রাইভেট ক্ষেত্রে নিয়োগকারী সংস্থা ইন্ট্যারন্যাশনাল ফিনান্স করপোরেশন মনে করে, সারা বিশ্বে স্বাস্থ্যে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ভারত ২য় শীর্ষ স্থানে আছে। মেডিক্যাল ট্যুরিজম আয় বাড়ায়, আবার কর্মী নিয়োগে সাহায্য করে। সরকার তাই প্রাইভেট স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যবসার বৃদ্ধিতে নির্দিষ্ট মন্ত্রকের মাধ্যমে সবরকম সহায়তা করে ও সুরক্ষা দেয়। দেশের স্বাস্থ্যনীতিও সেই অনুসারে তৈরি করা হয়েছে — একেবারে 'টেলর মেড'।

এই 'টেলর মেড' স্বাস্থ্যনীতির দরকার কেন? কেন না এ দেশে ৮০ শতাংশ আউটডোর রোগী এবং ৬০ শতাংশ ইনডোর রোগীর চিকিৎসা পরিষেবা দেয় প্রাইভেট বা বেসরকারি ক্ষেত্র। আউটডোরে প্রাইভেট চিকিৎসা করাতে আসা রোগীদের ৪০ শতাংশের আবার চিকিৎসা হয় 'আনকোয়ালিফায়েড' প্র্যাকটিশনার্সদের দ্বারা। প্রচলিত অর্থে যাদের 'কোয়াক' বলে অভিহিত করা হয়। প্রাইভেট ক্ষেত্রের ৭২ শতাংশ জুড়ে আছে নিজস্ব বা পারিবারিক মালিকানায় চালানো ক্লিনিক, নার্সিং হোম, ছোট হাসপাতাল— যেগুলি বড় হাসপাতাল বা কর্পোরেট-প্রাইভেট হেলথ ইন্ড্রাস্ট্রি থেকে চরিত্রে সম্পূর্ণ ভিন্ন। দিনকে দিন কর্পোরেট স্বাস্থ্য পরিষেবা ক্ষেত্র বাড়ছে এবং ব্যক্তিগত ক্লিনিক, ক্ষুদ্র হাসপাতালের সংখ্যা কমছে।

কর্পোরেট ক্ষেত্রও ক্রমশ এই ছোট হাসপাতালগুলির সাথে বাণিজ্যিক বোঝাপড়ায় লিপ্ত হচ্ছে এবং কর্পোরেটের পরিষেবা ক্ষেত্রের পরিধি বাড়াতে এইগুলিকে ব্যবহার করছে। স্বাস্থ্যক্ষেত্রে মোট খরচের মধ্যে ৩০ শতাংশের নিচে আছে সরকারি খরচ। ২০ শতাংশ আউটডোর রোগী, ৪০ শতাংশ ইনডোর রোগী এবং ৬০ শতাংশ মরণাপন্ন রোগীর চিকিৎসা সরকারি হাসপাতাল-স্বাস্থ্যকেন্দ্রেই হয়। এই সামান্য বরাদ্দের সরকারি খরচ থেকেই দেশের 'প্রতিষেধক' স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ও 'স্বাস্থ্যোন্নয়ন কর্মসূচির' ১০০ শতাংশ চলে — যেখানে কর্পোরেট বা প্রাইভেট স্বাস্থ্যব্যবসায়ীরা অংশ নেয় না। মেডিক্যাল, নার্সিং ও অন্যান্য শিক্ষা চালাতেও সরকারের এই বরাদ্দ থেকেই খরচ হয়। মানুষের স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের জন্য সরকারি বাজেট বরাদ্দ যে অত্যন্ত কম তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই এই বিস্তীর্ণ স্বাস্থ্য পরিষেবা ক্ষেত্রে অবাধ ব্যবসা করতে এবং মুনাফা অর্জন করতে যাতে কোনও অসুবিধা দেশি-বিদেশি পুঁজির মালিকদের এবং তাদের সুবিধাদানকারী সরকারের না হয় সেই উদ্দেশ্যেই খসড়া স্বাস্থ্য নীতি ২০১৫ তৈরি করা হয়েছে। নয়া স্বাস্থ্য নীতিতে স্বাস্থ্য মানুষের অধিকার নয়, বাজারের পণ্য। টাকার বিনিময়ে কিনে নিতে হবে। মানুষকে স্বাস্থ্য দেওয়ার দায় সরকারের নয়। গরিবদের জন্য সরকারি খরচে স্বাস্থ্য বিমা করে দেওয়া হবে, যার মাধ্যমে তারা স্বাস্থ্য-পরিষেবা কেনার দাম মেটাবে। সরকারি হিসাবে গরিবের সংখ্যা তো ক্রমশ কমছে। বাকিরা স্বাস্থ্য পাবে মূলত বিমার মাধ্যমে। বিমার 'প্রিমিয়াম' তাদের

চারের পাতায় দেখুন

এ উচ্ছ্বাস কতটা স্বতঃস্ফূর্ত

'চতুর্থীতেই অষ্টমীর ভিড়'— কাগজে কাগজে হেডলাইন, টিভি চ্যানেলে চ্যানেলে রিপোর্টারদের মুহূর্মুহু উত্তেজিত ঘোষণা।

আনুষ্ঠানিক পুজো শুরু হতে আরও তিনটে দিন বাকি। তার আগেই মহানগরী জুড়ে জনস্রোত। বাচ্চা, যুবক, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা হেঁটে চলেছে শহরের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত, এ মণ্ডপ থেকে ও মণ্ডপ। মাঝে মাঝেই ট্র্যাফিক পুলিশ কিংবা উল্টোদিকের কোনও দর্শনার্থীকে জিজ্ঞাসা, অমুক মণ্ডপটা কোন দিকে বলতে পারেন।

কয়েক বছর আগেও যাঁরা একটু নিরিবিলিতে মণ্ডপের সাজসজ্জা দেখতে বেরোতেন, তাঁরা মূলত ষষ্ঠীর দিনটিকেই পছন্দ করতেন। ফলে সেই অর্থে পুজো শুরু হয়ে যেত সপ্তমীর এক দিন আগে থেকেই। এখন শুরু চতুর্থী থেকেই। এই যে ক'দিন আগে থেকেই মানুষ রাস্তায় নেমে পড়ছে, এটা কি শুধু ভিড় এড়ানোর জন্যই। তা হলে চতুর্থীতেই কেন অষ্টমীর ভিড় হবে! পঞ্চমীতেই কেন জনস্রোতের চাপে মণ্ডপ বন্ধ করে দিতে হবে!

আগে নামকরা পুজোমণ্ডপগুলির উদ্বোধন হত ষষ্ঠীর দিন। কোথাও অতি উৎসাহী উদ্যোক্তারা হয়ত তার এক দিন আগেও উদ্বোধন করে দিতেন। কিন্তু এ তো তৃতীয়া-চতুর্থী বা তারও আগে থেকেই উদ্বোধন হয়ে যাচ্ছে। এ কি শুধু উদ্যোক্তাদের অতি-উৎসাহ, নাকি আরও কোনও বিষয় আছে এর মাঝে!

আপনি আপনার পরিবার বা বন্ধুদের নিয়ে কোন কোন মণ্ডপ দেখতে যাবেন তা কীভাবে ঠিক করেন? খবরের কাগজ এবং টিভি চ্যানেলগুলি তাদের প্রচারে যে মণ্ডপগুলিকে প্রথম সারিতে রাখে আপনিও সেগুলিরই খোঁজ করেন তো! কয়েক বছর ধরেই দেখা যাচ্ছে, পুজোর অনেক আগে থেকেই খবরের কাগজ, বিশেষত টিভি চ্যানেলগুলি মণ্ডপের সাজসজ্জার পুঙ্খানুপঙ্খ বিবরণ প্রচার করতে থাকে। একশো দিন আগে থেকেই তারা শুরু করে দেয় প্রহর গোনা। উদ্যোক্তারা নিজেরাও ব্যানার হোর্ডিং লাগিয়ে, খবরের কাগজে টিভিতে বিজ্ঞাপন দিয়ে তাদের পুজোটাই যে সেরা পুজো, তার প্রচার চালাতে থাকে। মানুষের মধ্যে উন্মাদনা সৃষ্টির জন্য পুজোর তিন মাস আগেই প্যান্ডেলের খুঁটি পুজো(!) হয় গ্ল্যামার ওয়ার্ল্ডকে হাজির করে। আগে এক-আধটা কোম্পানি সেরা পুজোর পুরস্কার ঘোষণা করত। তা-ও সেই ঘোষণা হত পুজোর শেষের দিকে— ব্যবস্থাপনার নানা দিক বিচার করে। এখন আর এক-আধটা নয়, গণ্ডায় গণ্ডায় কোম্পানি গণ্ডায় গণ্ডায় পুরস্কার ঘোষণা করে এবং সে-সবই পুজোর আনুষ্ঠানিক শুরুর অনেক আগে থেকেই। প্রায় প্রতিটা মণ্ডপই কোনও না কোনও কোম্পানির পুরস্কার পেয়েই যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ওই কোম্পানি হয় ওই মণ্ডপগুলির স্পনসর, না হয় তাদের বিপুল পরিমাণ বিজ্ঞাপন মণ্ডপের বাইরে ভেতরে চারিদিকে সাঁটা থাকে। কোম্পানিগুলিই যেহেতু খরচ যোগাচ্ছে, তাই তাদের স্বার্থের দিকটা উদ্যোক্তাদের দেখতেই হয়। কোম্পানিগুলি চায় তাদের পণ্যের বিজ্ঞাপন দর্শকরা বেশি দিন বেশি সময় ধরে দেখুক। তাই তারা আর চার দিনের পুজোয় সন্তুষ্ট নয়। এই ব্যবসায়িক স্বার্থেই পুজোকে কমপক্ষে আরও চারদিন বাড়িয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা।

আবার শুধু দিন বাড়ালেই তো হয় না, দর্শকদের মণ্ডপে টেনে আনা চাই। তা না হলে তো ষোল আনাই মাটি। এ ক্ষেত্রে মাঠে নামে কো-স্পনসররা। কারা তারা? টিভি চ্যানেলগুলি। তারা উদ্বোধনের অনেক আগে থেকেই ধারাবিবরণী শুরু করে দেয়। সন্ধ্যাগুলি মাতিয়ে তোলা হয় 'বিশিষ্ট' ব্যক্তিদের ডেকে এনে। আর এই পল্লবিত বিবরণ যতই কানের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করে, ততই আকুল করে তোলে দর্শকের মন। না রহিতে পারে ঘরে। ফলে কোন মণ্ডপ দেখতে আপনি বেরোবেন, আদৌ বেরোবেন কি না, তা ঠিক করে দেয় মিডিয়ার ঐ ধারাবিবরণী।

মিডিয়ার প্রচার ছাড়াও শুরু হয়েছে কর্পোরেট সংস্থার টোটাল স্পনসরশিপ। তারা তাদের বিপুল পরিমাণ টাকার থলি নিয়ে উৎসবের আবেগকে তাদের পণ্যের প্রচারের মাধ্যম করে তোলে। এবার 'সবচেয়ে বড় দুর্গা'র পিছনেও ছিল এমনই কর্পোরেট সংস্থার টাকার থলি। তাদের সংখ্যাহীন ব্যানার হোর্ডিং আর খবরের কাগজ টিভির বিজ্ঞাপনে আসমুদ্রহিমাচল ভারতবাসী জেনে গেছে বিশ্বের সবচেয়ে বড় দুর্গার কথা। চক্ষু সার্থক করতে মানুষ ছুটে এসেছে অন্য রাজ্য, এমনকী প্রতিবেশী দেশ থেকেও। মানুষের চক্ষু সার্থক না হলেও কোম্পানির উদ্দেশ্য ষোল আনাই সার্থক হয়েছে।

'বড় দুর্গার' বিপর্যয়ের ঘটনা প্রশাসনের ভূমিকাকেও বেআব্রু করে দিয়েছে। সিপিএম শাসনের প্রথম দিকে পুজোয় দলের ভূমিকা ছিল খানিকটা ঘোমটার আড়ালে। পরের দিকে সিপিএমের দ্বিতীয় বা তার পরের সারির নেতারা পুজোর আসরে জাঁকিয়ে থাকতেন। এই সরকারের তো কোনও কিছুতেই রাখঢাকের ব্যাপার নেই। কোনওটা কাউন্সিলরের পুজো তো কোনওটা এমএলএ-র, আবার কোনওটা এমপি-র। এ বাদেও আছেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী। তিনিও ছুটছেন এ মণ্ডপ থেকে ও মণ্ডপে, উদ্বোধন করে চলেছেন একটার পর একটা। ঘনিষ্ঠ নেতাটির পুজোর থিমও ঠিক করে দিচ্ছেন তিনিই। শুধু কি সরকারি নেতা-মন্ত্রীদের পুজোগুলিই, অন্যরাও যাতে সরকারের স্নেহাশিস থেকে বঞ্চিত না হয় তার জন্য পরিবেশ প্রভৃতি নানা বাহানা তুলে পুরসভা-সরকারের পক্ষ থেকেও থাকে অঢেল পুরস্কারের ঘোষণা। এ সবের মধ্যে নেতাদের দেবভক্তির থেকেও ভোটের হিসেবটাই যে বড় তা সাধারণ মানুষেরও বুঝতে খুব একটা অসুবিধা হয় না। অন্য দিকে কর্পোরেট কোম্পানিগুলি যে তীব্র বাজার সংকটে ভুগছে তা থেকে কিছুটা হলেও স্বস্তি দিতে পুজোয় এই সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা একটা বিরাট ভূমিকা পালন করে। এর দ্বারা শাসক দলের সাথে তাদের বোঝাপড়াটাও আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠছে।

এবার পুজোয় চল্লিশ হাজার কোটি টাকার ব্যবসা হয়েছে সংবাদে অবাক হয়ে সেদিন নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্র প্রশ্ন করল, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে আমি মণ্ডপ দেখব, তার সঙ্গে ব্যবসার কী সম্পর্ক রয়েছে? এ ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র আর সাধারণ মানুষের মধ্যে ধারণার বিশেষ পার্থক্য নেই। বহু মানুষই বুঝতে পারে না যে, এই উৎসবের আবেগে ভর করেই কোম্পানিগুলি তাদের নতুন নতুন পণ্য বাজারে নিয়ে আসে। নতুন ফ্যাশানের ডিজাইন নিয়ে আসে পোশাকের কোম্পানিগুলি, যার লক্ষ্য মধ্যবিত্তের একটা বড় অংশ। কোম্পানিগুলির ডিজাইনাররাই এমনকী ঠিক করে দেয় আপনি পঞ্চমী থেকে নবমী কোন দিন কোন পোশাকটা পরবেন। উৎসবকে কেন্দ্র করে জাঁকিয়ে ওঠে সৌন্দর্য্য ব্যবসা। বাজারে আসে হরেক রকমের

ছয়ের পাতায় দেখুন

সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সর্বভারতীয় যুক্ত আন্দোলন নিয়ে বামদলগুলিকে কমরেড প্রভাস ঘোষের চিঠি

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ১৫ অক্টোবর সিপিআই(এম), সিপিআই, সিপিআই (এম এল)-লিবারেশন, আরএসপি ও ফরওয়ার্ড ব্লকের সাধারণ সম্পাদকদের প্রতি একটি চিঠি পাঠিয়ে যুক্ত বামপন্থী আন্দোলনের কর্মসূচি স্থির করার জন্য জরুরি বৈঠকের প্রস্তাব দেন।

দেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পরিবেশ ধ্বংস করতে বিজেপি আরএসএস যেসব জঘন্য কাজ করে যাচ্ছে, তার উল্লেখ করে তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। চিঠিতে তিনি বলেছেন, এই বিপদকে প্রতিহত করার একমাত্র পথ হচ্ছে, সারা দেশে একেবারে তৃণমূল স্তর থেকে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে বামপন্থীদের ঐক্যবদ্ধ সংগঠিত আন্দোলন গড়ে তোলা। এই উদ্দেশ্যে ছয় বামদলের একটি বৈঠক সত্বর দিল্লিতে আহ্বান করার জন্য তিনি অনুরোধ করেন।

সিপিআইএম সাধারণ সম্পাদক কমরেড সীতারাম ইয়েচুরি টেলিফোনে এস ইউ সি আই (সি) পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তীর সাথে কথা বলেন এবং ৩১ অক্টোবর দিল্লিতে সিপিআইএম অফিসে উভয়ের মধ্যে প্রাথমিক কথাবার্তায় সীতারাম ইয়েচুরি জানান, এস ইউ সি আই (সি)-র প্রস্তাবের সঙ্গে তাঁরা সম্পূর্ণ একমত এবং শীঘ্রই ছয় দলের বৈঠক ডাকা হবে।

অ্যাবেকার আন্দোলনে বাংলা-হিন্দিতেও বিদ্যুৎ বিল চালু

অ্যাবেকার সাধারণ সম্পাদক প্রদ্যোৎ চৌধুরী ১৫ অক্টোবর এক বিবৃতিতে বলেন, বহু দিন ধরে বিদ্যুতের মাশুল কমানোর দাবির সাথে বিদ্যুৎ বিলকে সহজ সরল করে বাংলা, হিন্দি ও ইংরেজিতে দেওয়ার দাবিতে আমরা আন্দোলন করে আসছিলাম। আজ থেকে তা চালু হয়েছে। দুঃখের বিষয়, এই সামান্য বিষয়টিও গ্রাহকদের আন্দোলন করে আদায় করতে হল। তিনি বলেন, আন্দোলনই পারে দাবি আদায় করতে। বিদ্যুৎ মাশুল ৫০ শতাংশ কমানো, এম ভি সি এ বাতিল এবং কোম্পানিগুলোর অ্যাকাউন্টস তদন্ত করে দুর্নীতি বন্ধ করার আন্দোলনকে আরও জোরদার করার আবেদন জানান তিনি।

লাউদোহা বিডিও-তে বিক্ষোভ

৮ অক্টোবর এস ইউ সি আই (সি)-র লাউদোহা আঞ্চলিক কমিটির নেতৃত্বে তিন শতাধিক নারী-পুরুষ বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। ডিজেলের দাম লিটার প্রতি ১৫ টাকা কমার পরিপ্রেক্ষিতে বাসের ভাড়া কমানো, ১০০ দিনের কাজ চালু করা, রাস্তাঘাটের সংস্কার, বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ, সমস্ত গরিব মানুষের জন্য বিপিএল কার্ড সহ ১৭ দফা দাবি তাঁরা তুলে ধরেন। বর্ধমান জেলা কমিটির সদস্য কমরেড গঙ্গা গড়াই ও কমরেড ঊষা আচার্য বক্তব্য রাখেন। তাঁরা বলেন, দাবি আদায় না হলে লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া হবে। লাউদোহা আঞ্চলিক কমিটি-র সম্পাদক কমরেড সব্যসাচী গোস্বামীর নেতৃত্বে ৭ জনের প্রতিনিধি দল বি ডি ও-কে স্মারকলিপি প্রদান করে।

সালানপুর বিডিও অফিসে ডেপুটেশন

অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ ফেল প্রথা পুনরায় চালু, ডিজেলের দামের সাথে সঙ্গতি রেখে বাসের ভাড়া কমানো, সমস্ত গ্রামে দু'বেলা পর্যাপ্ত পানীয় জল সরবরাহ, সমস্ত গরিব পরিবারকে বি পি এল-এর আওতায় আনা ও তাদের বিনামূল্যে বিদ্যুৎ এবং ইন্দিরা আবাস প্রদান, স্থানীয় শিল্পে স্থানীয় বেকারদের কাজের অগ্রাধিকার দেওয়া, সমস্ত গরিব বিধবা এবং বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকে পেনশন প্রদান, ১০০ দিনের কাজের প্রকল্প চালু রেখে ২০০ দিনের কাজের সুবন্দোবস্ত করা সহ ১৩ দফা দাবিতে ১৪ অক্টোবর বর্ধমান জেলার এস ইউ সি আই(সি) চিত্তরঞ্জন-রূপনারায়ণপুর লোকাল কমিটির পক্ষ থেকে সালানপুর বিডিও অফিসে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। নেতৃত্ব দেন লোকাল সম্পাদক কমরেড প্রণবেশ দত্ত।

খসড়া জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি

তিনের পাতার পর

নিজেদেরই দিতে হবে। সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র-হাসপাতাল বা পরিকাঠামো আর বিশেষ বাড়বে না। যে পরিষেবা সরকারি ক্ষেত্রে নেই তা বেসরকারি ক্ষেত্র কর্পোরেট এবং এন জি ও থেকে বিমা ব্যবস্থার মাধ্যমে কিনে নেওয়া হবে। স্বাস্থ্যখাতে সরকারি খরচ যতটুকু বরাদ্দ হচ্ছে তা নতুন করে 'স্বাস্থ্য ট্যাক্স' এবং 'স্বাস্থ্য সেস' চালু করে তুলে নেওয়া হবে। এই হচ্ছে নতুন স্বাস্থ্য নীতির মূল কথা।

সরকারি খরচের পরিমাণ কম, স্বাস্থ্যহানির মূল কারণ

খসড়া নীতিতে সরকার স্বীকার করেছে, স্বাস্থ্যক্ষেত্রে উন্নতি করতে হলে সরকারকেই জিডিপি-র কমপক্ষে ৫ শতাংশ খরচ করতে হবে। ভারতে বর্তমানে যা সাকুল্যে ১.২ শতাংশ। শতকরা হিসাবে মোট স্বাস্থ্য বাবদ খরচের মাত্র ৩০ শতাংশ সরকার খরচ করে। এই কারণেই সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যের খরচ বাড়ে এবং বহু মানুষ দারিদ্রসীমার নিচে চলে যায়। এন এস এস ও সার্ভে বলছে গ্রামাঞ্চলে ঋণগ্রস্ত হবার অন্যতম প্রধান কারণ 'পণ' বা 'ডাউরি প্রথা' এবং দ্বিতীয় কারণ অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়া। রুগ্নতার কারণে মাত্রাধিক খরচের জন্য দেশের ৬৩ মিলিয়ন মানুষ প্রতি বছর দরিদ্র হয়ে যায়। ২০০৪-'০৫ সালে যেখানে ১৫ শতাংশ পরিবার এরকম খরচের ধাক্কায় দিশাহারা হয়ে পড়ত, ২০১১-'১২ সালে তা ১৮ শতাংশে পৌঁছেছে। এন আর এইচ এমের মাধ্যমে কিছু নির্দিষ্ট পরিষেবা বিনামূল্যে দেওয়া হলেও, অন্যান্য সব অসুখের ক্ষেত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও ওষুধপত্র কেনার জন্য সব মানুষকেই যে নানা ফিজ বা মূল্য গুনে দিতে হয় তা খসড়া নীতি অস্বীকার করেনি। এত কিছু স্বীকার করার পরেও সরকারি জিডিপি ধাপে ধাপে মাত্র ২.৫ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হবে বলে স্বাস্থ্যনীতিতে ঘোষণা করা হয়েছে। তাও এখনই নয়, ২০২৫ সাল পর্যন্ত তার সীমা বিস্তৃত। ২০১৪ সালে প্রকাশিত বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার (হু) রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে সর্বোচ্চ বিমাভুক্ত জনসাধারণের দেশ আমেরিকাতে স্বাস্থ্য খাতে সরকারি খরচ ৪৭.৮ শতাংশ, স্বাস্থ্য খাতে জিডিপি-র (সরকারি ও ব্যক্তিগত) খরচ ১৭.৭ শতাংশ। ইংল্যান্ডে যথাক্রমে ৮২.৪ শতাংশ এবং ৯.৪ শতাংশ, চীনে ৫৫.৯ এবং ৫.১ শতাংশ, কিউবায় ৯৪.৯ এবং ১০ শতাংশ, নেপালে ৪৫.৩ এবং ৬.১ শতাংশ। ভারতে ৩০.৫ ও ৩.৯ শতাংশ। সরকারি বরাদ্দের উপরই নির্ভর করে শিশুমৃত্যু, প্রসূতি মৃত্যুর হার, জন্মের সময় প্রত্যাশিত বয়সের সীমা এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য সূচক এবং স্বাস্থ্য পরিসংখ্যান।

দেশের আর্থিক অবস্থা খারাপ এবং সম্পদের অভাব এই অছিলায় মোদি সরকার স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধিতে কার্পণ্য করছে। খরচ কমানোর অজুহাতে এক ধাক্কায় স্বাস্থ্য বাজেটের ২০ শতাংশ অর্থাৎ প্রায় ৬,৫০০ কোটি টাকা ছেঁটে দিয়েছে। অথচ মালিক শ্রেণির স্বার্থে কর ছাড়, ভর্তুকি দান, ঋণ মকুব, নতুন ঋণের ব্যবস্থা সবই চলে অবাধে। কালো টাকার পাহাড় জমতে থাকে। দুর্নীতির পাঁকে পূর্বতন কংগ্রেস (ই) সরকারের মতো বিজেপি-র কেন্দ্র ও রাজ্য স্তরের নেতা-মন্ত্রীরা ক্রমশ ঢাকা পড়তে থাকে।

বিমা মাধ্যমে স্বাস্থ্য দেওয়ার পরিকল্পনা খসড়া স্বাস্থ্যনীতিতে

'মিলেনিয়াম গোল' — এই ঘোষণায় সার্বজনীন স্বাস্থ্যপরিষেবা দেওয়ার কথা আছে। আর তার জন্য সরকার ঠিক করেছে — সব নাগরিককে স্বাস্থ্য-পরিষেবা নিতে হলে হেলথ এনটাইটেলমেন্ট কার্ড (এইচ ই সি) করাতে হবে। যা দেখিয়ে সে সরকারি ইনসিওরেন্সভুক্ত বেসরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে পরিষেবা পাবে। কে এই বিমার প্রিমিয়াম দেবে? দারিদ্রসীমার নিচের (বি পি এল) পরিবারগুলোকে বছরে ৩০ টাকার বিনিময়ে পরিবারকে পাঁচজনের জন্য এই 'কার্ড' করাতে হবে এবং বিমার প্রিমিয়াম সরকার দিয়ে দেবে। এই রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বিমা যোজনা (আর এস বি ওয়াই) প্রকল্পে বছরে ৩০,০০০ টাকা পর্যন্ত ঐ বিমাভুক্ত পরিবার পরিষেবা পাবে। তার পরে কিছু প্রয়োজন হলে, বা বিমাভুক্ত নয় এমন সদস্যের অসুখ হলে কোথায় যাবে তার কোনও দিশা এই যোজনাতে নেই। সরকার বলছে ইতিমধ্যে দেশের ৩৭০ মিলিয়ন মানুষ এই বিমা যোজনার আওতাভুক্ত হয়েছে এবং সমাজের অতি-গরিব, এস সি, এস টি প্রভৃতি পরিবারগুলিও এই বিমার দ্বারা উপকৃত হচ্ছে। আবার খসড়া নীতিতেই সরকার প্রকাশ করেছে — বহু ক্ষেত্রে বিমাভুক্তদের চিকিৎসা প্রত্যাখ্যান করা হচ্ছে। কিছু পরিষেবা প্রয়োজনের অতিরিক্ত দেওয়া হচ্ছে, বাড়তি টাকা নেওয়া হচ্ছে। ভুক্তভোগী মানুষের আরও বহু বিচিত্র ও বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা আছে। তবুও সরকার চাইছে সমস্ত ধরনের সরকারি বিমাভুক্ত পরিষেবাগুলিকে এক ধরনের বিমার আওতায় আনা হোক। অদূর ভবিষ্যতে সরকার এই ব্যবস্থা পরখ করে স্থির করবে — বিমার মাধ্যমে স্বাস্থ্য পরিষেবা ক্রয় করবে, সরাসরি বেসরকারি ক্ষেত্রে থেকে ক্রয় করবে নাকি সরকারি হাসপাতাল থেকে এই পরিষেবা প্রদান করবে। 'হেলথ ইনসিওরেন্স' যে 'স্বাস্থ্যের অধিকারে'র সমান নয় বা এক জিনিস নয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

মেডিক্যাল-প্যারামেডিক্যাল শিক্ষা কার্যত ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বেসরকারি স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা ব্যবসায়ীদের হাতে। ক্যাপিটেশন ফি, উচ্চ মূল্যের বেতন দিয়ে এক শ্রেণির ছেলেমেয়ে ডাক্তার-নার্স-টেকনিসিয়ানের ডিগ্রি পাবে, যার সঙ্গে মেধার কোনও সম্পর্ক থাকবে না। সারা দেশে এবং এ রাজ্যেও প্রাইভেট মেডিক্যাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার প্রতিযোগিতা চলছে। কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারগুলি নানা অজুহাতে পুঁজির মালিকদের তা খোলার সব সুযোগ করে দিচ্ছে। গুণমান এবং ডাক্তার সহ কেমন স্বাস্থ্যকর্মী তৈরি হচ্ছে তা দেখার দায় কারও নেই। কারণ সরকারি নীতি হচ্ছে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে মানবসম্পদ বাড়িয়ে চলো। অথচ কীভাবে, কোথায় তাদের নিয়োগ হবে তার কোনও সুনির্দিষ্ট নীতি এই খসড়া স্বাস্থ্যনীতিতে নেই। সারা দেশে বর্তমান অ্যালোপ্যাথিক বিভাগে প্রতি বছর প্রায় ৬০ হাজার এম বি বি এস ডাক্তার তৈরি হয়। এর বাইরে দন্ত চিকিৎসক, হোমিওপ্যাথি, আয়ুর্বেদি, ইউনানি, সিদ্ধা প্রভৃতির ডাক্তাররা আছে।

কী কেন্দ্র সরকার, কী রাজ্য সরকার কেউই ডাক্তার-স্বাস্থ্যকর্মী-নার্স নিয়োগের জন্য নতুন পদ সৃষ্টি করছে না, অথচ 'ডাক্তাররা গ্রামে যায় না' বলে প্রচার করে যাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ সহ সারা দেশে সরকারি পদে ডাক্তার ঘাটতি প্রায় ১৪ শতাংশ। দেশের গৃহীত মানদণ্ড ইন্ডিয়ান পাবলিক হেলথ স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী সব ধরনের স্বাস্থ্যকর্মীর ঘাটতি ৫০ শতাংশের কাছাকাছি। স্বাস্থ্যকেন্দ্র, হাসপাতাল, শয্যার ঘাটতি গড়ে ৫০ শতাংশ। অথচ স্বাস্থ্য নীতিতে নির্ভরতা দেখানো হয়েছে প্রাইভেট এবং কর্পোরেট হাসপাতালের প্রতি। ওষুধ তৈরির রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রগুলি (পাবলিক সেক্টর আন্ডারটেকিং) যেমন হ্যাল, আইডিপিএল, স্মিথ স্ট্যানি স্ট্রিট, বেঙ্গল কেমিক্যাল প্রভৃতি রুগ্ন মৃতপ্রায়। চিকিৎসা সরঞ্জাম তৈরির অধিকাংশ এখনও বিদেশি প্রস্তুতকারকদের কব্জায়। ওষুধ এবং সরঞ্জাম বিক্রির ক্ষেত্রে মুনাফা লাগামছাড়া। দ্বিগুণ থেকে ৩০-৪০ গুণ। স্বাস্থ্যনীতিতে এ বিষয়ে কোনও উচ্চবাচ্য নেই। অন্যদিকে জনওষুধের নামে ন্যায্যমূল্যের ওষুধ-সরঞ্জামের দোকান খুলে বিনা মূল্যে ওষুধ পাওয়ার অধিকার হরণ করা হচ্ছে। আশাকর্মীদের স্থায়ীকরণের কোনও সুপারিশ নেই স্বাস্থ্য নীতিতে, তেমনি লক্ষ লক্ষ আনকোয়ালিফায়েড গ্রামীণ চিকিৎসকদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বাস্থ্যকর্মী করে গড়ে তুলে, স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় নিয়োগ করারও কোনও দিশা দেখানো হয়নি।

এই খসড়া স্বাস্থ্যনীতি সব অর্থেই স্বাস্থ্য-পরিষেবা নিয়ে ব্যবসা করার জন্য কর্পোরেট স্বার্থে পুঁজি বিনিয়োগের অনুকূলে। আজও গড়ে দেশের ৫০ শতাংশ মানুষ, আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করতে পারে না। আরও ৩০-৪০ শতাংশ নিম্নবিত্ত-মধ্যবিত্ত মানুষ রুগ্ন হলে কোনওরকমে বেঁচে থাকার লড়াই করে যাচ্ছে। এই জনবিরোধী স্বাস্থ্যনীতিকে প্রতিহত করে দেশের ৯০ শতাংশ মানুষের স্বার্থে জনমুখী স্বাস্থ্য নীতি প্রণয়নের জন্য সংগ্রাম আজ একান্ত জরুরি।

রঘুনাথপুরের বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জমিদাতাদের চাকরির দাবিতে নবান্ন অভিযান

পুরুলিয়া জেলার রঘুনাথপুর মহকুমায় তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের প্রথম পর্যায়ের কাজ প্রায় শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু জমিদাতাদের চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি ডি ভি সি কর্তৃপক্ষ খেলাপ করে চলেছে। চাকরি দূর অস্ত ঠিকা শ্রমিকের কাজেও জমিদাতাদের বঞ্চিত করে বাইরে থেকে লোক নিয়োগ করা হচ্ছে। চাকরির ক্ষেত্রে জমিদাতাদের অগ্রাধিকারের দাবিতে চলমান আন্দোলনকে তীব্রতর করার উদ্দেশ্যে ২৯ সেপ্টেম্বর ল্যান্ড লুজার্স অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে রাজ্যের অর্থ, শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রীকে ডেপুটেশন দেওয়ারর জন্য সহস্রাধিক জমিদাতা মিছিল সহকারে নবান্ন অভিযান করে। মন্ত্রীর অনুপস্থিতিতে দপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিক স্মারকলিপি গ্রহণ করে সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেন। সংগঠনের সভাপতি চিন্ময় ব্যানার্জী ও সম্পাদক দেবজিৎ ব্যানার্জী জানিয়েছেন, অবিলম্বে সমস্যার সমাধান না হলে আরও শক্তিশালী আন্দোলনের পথ নেওয়া হবে।

রোকেয়া নারী উন্নয়ন সমিতি-র নিজস্ব কার্যালয় উদ্বোধন বহরমপুরে

বহরমপুর শহরে ২ অক্টোবর 'রোকেয়া নারী উন্নয়ন সমিতি'-র নিজস্ব ভবন উদ্বোধন হল। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডাঃ এ হাসান, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ সেখ মহম্মদ জাকি, অধ্যক্ষা অনুরাধা সেনগুপ্ত, সুজাতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যক্ষা কেয়া ঘটক, প্রবীণ অধ্যাপক জগবন্ধু বিশ্বাস এবং অসিত কুমার বাগচি সহ প্রায় শতাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। যাদের জন্য এই ভবন, সমাজের সেই অবহেলিত নির্যাতিত অসহায় নারীদের উপস্থিতিও ছিল উল্লেখযোগ্য। এইসব নারীদের আত্মসম্মান নিয়ে বাঁচার পথ ও আইনি সুরক্ষা প্রদানে সমিতির দীর্ঘদিনের অবদানের বিষয় উল্লেখ করে বক্তব্য রাখেন সংস্থার সম্পাদিকা খাদিজা বানু, সভাপতি প্রবীণ অধ্যাপিকা সুজাতা দে বসু। সমিতির সহায়তায় স্বনির্ভর হওয়ার প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখেন এক সময়ের নির্যাতিতা উরুফা খাতুন, রুবেয়া খাতুন ও সারভানু খাতুন। নারী কল্যাণে রোকেয়ার অবদান নিয়ে গীতি আলেখ্য পরিবেশিত হয়।

ক্ষতিগ্রস্ত চাষিদের চেক বিলির দাবিতে খাকুড়দহ পঞ্চায়েতে ডেপুটেশন

সম্প্রতি দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার খাকুড়দহ পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে মাইকে প্রচার করা হয় যে, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত চাষিরা পঞ্চায়েতের বকেয়া ট্যাক্স পরিশোধ না করলে ক্ষতিপূরণের চেক পাবেন না। জনগণের দুর্দশার সুযোগ নিয়ে এই ভাবে পঞ্চায়েতের ট্যাক্স আদায় করা জনস্বার্থবিরোধী। এর প্রতিবাদে ১ অক্টোবর এস ইউ সি আই (সি) খাকুড়দহ লোকাল কমিটির পক্ষ থেকে পঞ্চায়েত অফিসে বিক্ষোভ দেখানো হয়। বিক্ষোভে শত শত চাষি ও সাধারণ মানুষ অংশগ্রহণ করেন। বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন দলের জেলা কমিটির সদস্য কমরেডস সুশীল মণ্ডল, জগন্নাথ দাস, রোশন আলি মোল্লা। কমরেড অনিলচন্দ্র নস্করের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের এক প্রতিনিধি দল প্রধানের সঙ্গে দেখা করেন। বিক্ষোভ সভায় সভাপতিত্ব করেন কমরেড মধু দাস। চেক বিলির দাবি ছাড়াও বিপিএল তালিকাভুক্তদের গৃহ-নির্মাণের আর্থিক সাহায্য এবং গরিব মানুষদের শৌচাগার তৈরির অর্থ দেওয়ার দাবিও জানানো হয়। প্রধান আলোচনায় সম্মত হয়ে বলেন যে, ট্যাক্স বকেয়া থাকলেও ক্ষতিগ্রস্ত চাষিরা ক্ষতিপূরণের চেক পাবেন এবং যে সব গরিব মানুষের নাম বিপিএল তালিকা থেকে বাদ গেছে, আবেদন করলে তাঁদের নামও তালিকায় অন্তর্ভুক্তির জন্য সংশ্লিষ্ট অফিসে পাঠানো হবে।

মেদিনীপুর হাসপাতালে পরিষেবা উন্নয়নের দাবি

জেলায় ডেঙ্গুর প্রকোপ ভয়াবহ। যেখানে মুখ্যমন্ত্রী সরকারি হাসপাতালে 'ফ্রি চিকিৎসার' ফানুস ওড়াচ্ছেন, সেখানে মেদিনীপুর হাসপাতালে ডেঙ্গু আক্রান্তদের আলাদা রেখে চিকিৎসা তো দূরের কথা, জ্বর নিয়ে ভর্তি হওয়া সকল রোগীকে ডেঙ্গু সহ সকল পরীক্ষা বিপুল ব্যয়ে বাইরের চিকিৎসা ব্যবসায়ীদের কাছে করাতে বাধ্য করা হচ্ছে, প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র কিনতে বাধ্য করা হচ্ছে, নেই পর্যাপ্ত ডাক্তার-নার্স।

এই অব্যবস্থার প্রতিবাদে ২৯ সেপ্টেম্বর এস ইউ সি আই (সি)-র পক্ষ থেকে হাসপাতাল গেটে বিক্ষোভ দেখানো হয়। বক্তব্য রাখেন কমরেডস মানিক পড়িয়া, দীপক পাত্র, রতন মুখার্জী প্রমুখ।

গবেষকদের বৃত্তি বন্ধ ঃ প্রতিবাদে দিল্লিতে বিক্ষোভ

ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশন সম্প্রতি সিদ্ধান্ত নিয়েছে এম ফিল এবং পি এইচ ডি ছাত্রদের 'নেট' পরীক্ষার বাইরে থাকা ছাত্রদের গবেষণাবৃত্তি বন্ধ করে দেওয়া হবে। ছাত্র ও শিক্ষাস্বার্থ বিরোধী এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দিল্লিতে ইউ জি সি দপ্তরে ২৭ অক্টোবর বিক্ষোভ প্রদর্শন করার সময় পুলিশ এবং সি আর পি এফ ছাত্র-ছাত্রীদের উপর নির্বিচারে লাঠিচার্জ করে।

এই বর্বরোচিত আক্রমণ মোদি সরকারের অগণতান্ত্রিক চেহারাকে আবারও নগ্ন করে দিল। এ আই ডি এস ও-র দিল্লি রাজ্য কমিটির সভাপতি কমরেড ভাস্করানন্দ সরকারের এই আচরণের তীব্র নিন্দা করার সাথে সাথে গবেষণাবৃত্তি বন্ধ করার সিদ্ধান্ত বাতিল করার দাবি জানিয়েছেন।

ইউ জি সি-র ফরমান। দিল্লিতে ডি এস ও-র বিক্ষোভ

ইউ জি সি গাইডলাইনের মাধ্যমে ক্যাম্পাসে এবং বাইরে ছাত্রছাত্রীদের চলাফেরা নিয়ন্ত্রণ, ডব্লুটিও সম্মেলনে শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা, কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিল সহ শিক্ষাস্বার্থ বিরোধী পদক্ষেপের বিরুদ্ধে ২০ অক্টোবর এ আই ডি এস ও দিল্লি রাজ্য কমিটি দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের নর্থ ক্যাম্পাসে এক বিক্ষোভ-সভার ডাক দেয়। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা ফ্যাকাল্টি ও কলেজের কয়েক শত ছাত্রছাত্রী বিক্ষোভে অংশ নেন। সংগঠনের দিল্লি রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড প্রশান্ত কুমার সহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

বাঁকুড়ায় জেলাশাসক দপ্তরে বিক্ষোভ

৬ অক্টোবর এস ইউ সি আই (সি)-র বাঁকুড়া জেলা কমিটির ডাকে পাঁচ শতাধিক মানুষ জেলাশাসক দপ্তরে ডেপুটেশন দেয়। জেলাকে খরার প্রকোপ থেকে মুক্ত করার জন্য স্থায়ী সেচ, মজুরদের কাজের দাবিতে, মূল্যবৃদ্ধি ও বিদ্যুতের দামবৃদ্ধির প্রতিবাদে, বাসভাড়া কমানো সহ নানা দাবি নিয়ে মিছিল করে বিক্ষোভ দেখানো হয়। জেলাশাসক দপ্তরের সামনে পুলিশবাহিনী মিছিল আটকালে সেখানে বক্তব্য রাখেন দলের জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড জয়দেব পাল এবং কমরেডস অসিত মণ্ডল, লক্ষ্মী সরকার, দিলীপ কুণ্ডু প্রমুখ। জেলাশাসক দপ্তরে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

বিদ্যুৎ মাশুল কমানোর দাবিতে ইন্দাসে বিক্ষোভ

বিদ্যুতের মাশুল কমানো, লোডশেডিং ও লো-ভোল্টেজের স্থায়ী সমাধান, বিদ্যুৎ সরবরাহে বেহাল অবস্থা দূরীকরণ, গত মরশুমের ক্ষতিগ্রস্ত বরো চাষিদের কৃষি বিদ্যুৎ বিল মকুব প্রভৃতির দাবিতে ১৪ অক্টোবর বাঁকুড়া জেলার ইন্দাসে স্টেশন ম্যানেজারের অফিসে বিক্ষোভ দেখানো হয়। পাঁচ শতাধিক গ্রাহক উপস্থিত ছিলেন। পরে সংগঠনের প্রথম আঞ্চলিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। দেবব্রত হাজরাকে সভাপতি ও নবকুমার শর্মাকে সম্পাদক করে ৩০ জনের নতুন কমিটি গঠিত হয়।

কাঁথিতে বিদ্যুৎগ্রাহকদের বিক্ষোভ

অস্থায়ী কৃষিগ্রাহকদের অতিরিক্ত টাকা ফেরত, রামনগর ও সাতমাইলে নতুন সাপ্লাই অফিস খোলার দাবিতে ১৫ অক্টোবর কাঁথি ডি ই দপ্তরে অ্যাবেকার নেতৃত্বে বিদ্যুৎগ্রাহকদের বিক্ষোভ

চা-শ্রমিক এবং চাষিমৃত্যুর ঘটনা উদ্বেগজনক

একের পাতার পর

হওয়ার আশঙ্কায় বর্ধমানের দুই কৃষকের আত্মহত্যার ঘটনা রাজ্যবাসীকে আর একবার বুঝিয়ে দিল, এ রাজ্যের কৃষকরা কতটা প্রকৃতি নির্ভর এবং অসহায়। সরকারের সেচ দপ্তর আছে, দপ্তরের মন্ত্রী আমলাদের জন্য বরাদ্দ থাকলেও সেচের জন্য কোনও ব্যবস্থা নেই। শিলাবৃষ্টিতে ফসল নষ্ট হয়ে যাওয়ায় বহু চাষিই সরকারের ঘোষিত ক্ষতিপূরণ পায়নি। সেচের অভাবে ফসল নষ্ট হয়ে যাওয়াতে কৃষকরা অত্যন্ত অসহায় অবস্থার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে আত্মহত্যার পথও বেছে নিচ্ছে। সরকারী নীতিই তাদের জীবনকে এই করুণ পরিণতির দিকে ঠেলে দিচ্ছে। আবার এই চাষিমৃত্যুর দায় এড়াতে অতীতের সিপিএম সরকারের মতই বর্তমান সরকারও 'পারিবারিক কারণে মৃত্যু' - এই গল্প রচনায় ব্যস্ত, যা অত্যন্ত নিন্দনীয়। আমরা অবিলম্বে মৃত কৃষকদের পরিবারগুলিকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া, ঋণগ্রস্ত সকল কৃষকদের সরকারি ঋণ মকুব করা এবং সেচ ও জলনিকাশি ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে রাজ্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছি।"

মহান নভেম্বর বিপ্লব স্মরণে

একের পাতার পর

করে গোটা বিশ্বের শান্তি ও গণতন্ত্র রক্ষা করেছেন। জার্মানির দিকে এগিয়ে চলার সময় কমরেড স্ট্যালিনের নেতৃত্বে লালফৌজ পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিকে, সেখানকার দেশপ্রেমিকদের সঙ্গে নিয়ে ফ্যাসিস্ট আগ্রাসন থেকে মুক্ত করেছিল এবং সেখানে জনগণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিল। জার্মানি, ইটালি ও জাপান — এই তিন দেশের সম্মিলিত অক্ষশক্তিকে পরাজিত করে সমাজতান্ত্রিক শক্তির অভূতপূর্ব বিজয় শুধু যে ফ্যাসিস্ট সামরিক শক্তিকে ধ্বংস করেছিল তাই নয়, সামগ্রিকভাবে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকেও দুর্বল ও কোণঠাসা করেছিল, যার ফলে উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশগুলিতে মুক্তিসংগ্রাম গড়ে তোলার অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল, মুক্ত হয়েছিল চিন, উত্তর কোরিয়া, ভিয়েতনাম ও কিউবার মতো দেশ। এইভাবে বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী শিবিরের সমান্তরালে গড়ে উঠেছিল সাম্রাজ্যবাদ ও যুদ্ধবিরোধী একটি শক্তিশালী সমাজতান্ত্রিক শান্তি শিবির। এই নতুন সভ্যতা গোটা বিশ্বের শোষিত নিপীড়িত মানুষকে যেমন প্রেরণা দিয়েছিল, তেমনই বিশ শতকের মহান মানবতাবাদীদের এবং ভারত সহ নানা দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামী নেতাদের প্রভূত প্রশংসা অর্জন করেছিল। তাঁরা স্ট্যালিন ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রভূত প্রশংসা করেছিলেন।

মহান মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, স্ট্যালিন, মাও সে-তুং এবং শিবদাস ঘোষের শিক্ষা থেকে এ কথাও আমরা জানি যে, পুঁজিবাদ থেকে সাম্যবাদে পৌঁছবার পথে সমাজতন্ত্র হল একটি অন্তর্বর্তী স্তর। মার্কসবাদী-লেনিনবাদী মাত্রেই এ কথা সহজে বুঝবেন যে, উত্তরণের এই পর্যায়ে শ্রেণি ও শ্রেণিসংগ্রামের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় না, ভিন্ন পরিস্থিতিতে, ভিন্ন রূপে তারা অবস্থান করে। এই নতুন পরিস্থিতিতে যদি শ্রমিক শ্রেণির রাষ্ট্র এবং দল মার্কসবাদ-লেনিনবাদের নীতি যথাযথভাবে অনুসরণ করে সাম্যবাদে উত্তরণের জন্য সমাজতন্ত্রের পথ ধরে এগোয় তাহলে অবশ্যই সেখানে পৌঁছানো যাবে। উল্টোদিকে যদি তারা মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও সমাজতন্ত্রের পথ থেকে বিচ্যুত হয়, তাহলে নিশ্চিত ভাবেই প্রথমে সংশোধনবাদ ও পরে পুনরায় পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ফিরে আসবে। ফলে, অবশ্যপ্রয়োজনীয় হল, দলের সাধারণ কর্মী-সমর্থক এবং শ্রমিক জনতার আদর্শগত ও সাংস্কৃতিক মান নিরবচ্ছিন্ন ভাবে উন্নত করে যাওয়া। কিন্তু এই বিষয়টিতে যথাযথ জোর দেওয়া হয়নি, অথবা দেওয়া সম্ভব হয়নি। ফল হিসাবে, অর্থনৈতিক ভিত্তি থেকে পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করা হলেও, প্রায় অলক্ষে উপরিকাঠামোয় তা নিজেকে সংহত করে নিজের শক্তি বৃদ্ধি করেছে এবং সেখান থেকে আক্রমণ চালিয়েই সমাজতন্ত্রের ভিত্তিকে ধ্বংস করেছে।

মার্কসবাদকে প্রথম থেকেই বুর্জোয়া শ্রেণির দু'ধরনের আক্রমণের সম্মুখীন হতে হয়েছে। এর একটি হল প্রকাশ্য ও প্রত্যক্ষ আক্রমণ, অন্যটি পরোক্ষ, গোপন ও কপট আক্রমণ। দ্বিতীয় আক্রমণটি বেশি ভয়ানক। কারণ, শ্রমিক শ্রেণি ও অন্যান্য খেটে-খাওয়া মানুষকে প্রতারিত ও বিভ্রান্ত করতে এই আক্রমণ শানানো হয় মার্কসবাদী শব্দসম্ভার ও বাচনভঙ্গির নামাবলি জড়িয়ে। বিপ্লবের আগে ও পরে শোধনবাদীদের আক্রমণের চরিত্র ছিল আলাদা ধরনের। বিপ্লবের পরে এই আক্রমণের ধরন হয়ে উঠেছিল আরও গোপন, প্রতারণামূলক এবং ছদ্মবেশী। স্বভাবতই এই আক্রমণ চিনতে পারা ছিল খুবই কঠিন। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ভাবে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় চোখে পড়ার মতো বিপুল উন্নয়ন ঘটা সত্ত্বেও সংশোধনবাদ ধীরে ধীরে উপরিকাঠামোয় নিজের নিয়ন্ত্রণ বিস্তার করছিল। স্ট্যালিন ও মাও সে-তুং উভয়েই জীবনের শেষ ভাগে এই বিপদ অনুভব করেছিলেন এবং সমাজতন্ত্রকে রক্ষার জন্য সংগ্রাম শুরু করেছিলেন। কিন্তু মৃত্যুর ফলে সংগ্রাম এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেননি। তাঁদের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে সংশোধনবাদীরা দল ও রাষ্ট্রের নেতৃত্ব ধীরে ধীরে কব্জা করে ফেলে এবং দলের সাধারণ কর্মী-সমর্থক ও সাধারণ মানুষের পিছিয়ে পড়া আদর্শগত ও সাংস্কৃতিক মানের সুযোগে সমাজতান্ত্রিক ভিত্তি ধ্বংস করে ধীরে ধীরে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনে। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, ক্রুশেভ, ব্রেজনেভ, গর্বাচেভ এবং লিউ শাও-চি, দেং জিয়াও-পিং-দের মতো সংশোধনবাদীদের বিশ্বাসঘাতকতায় শ্রমিক শ্রেণির বিপ্লব সাময়িকভাবে পরাস্ত হয়েছে। কিন্তু সমাজবিকাশের নিয়মটিকে দ্বান্দ্বিকভাবে বিশ্লেষণ করে মার্কসবাদীরা দেখিয়েছেন যে, শ্রমিক শ্রেণির বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী। এই বিপ্লব আবার হবে এবং তা হবে সকল দেশেই।

মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের ছাত্র হিসাবে এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনায় আমরা গভীর ব্যথা অনুভব করেছি, কিন্তু কখনই হতাশাগ্রস্ত হইনি। লেনিন দেখিয়েছেন, শ্রেণি ও শ্রেণি সংগ্রাম এক ধাক্কায় অবলুপ্ত হয় না। শ্রেণিগুলির অবলুপ্তির জন্য প্রয়োজন দীর্ঘস্থায়ী, লাগাতার এবং শ্রমসাধ্য সংগ্রাম, কারণ উচ্ছেদ হওয়ার পর বুর্জোয়া শ্রেণির ক্ষমতা আগের চেয়ে বেড়ে যায় এবং পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য তাদের প্রচেষ্টা হয়ে ওঠে আরও তীব্র ও আরও বেশি মরিয়া। ফলে, সাত দশকের কিছু বেশি সময় ধরে স্থায়ী হওয়া প্রথম সর্বহারা বিপ্লব যে শ্রেণিগুলির ও শ্রেণিসংগ্রামের বিলোপ ঘটাতে পারেনি, তা কিছু অস্বাভাবিক বিষয় নয়। শ্রমিক শ্রেণির প্রথম অভ্যুত্থান 'প্যারি কমিউন' মাত্র কয়েক মাস স্থায়ী হয়েছিল। কিন্তু প্যারি কমিউনের অমূল্য শিক্ষা মার্কসবাদকে সমৃদ্ধ করেছিল এবং লেনিন সৃজনশীল ভাবে সেই শিক্ষা প্রয়োগ করেছিলেন। একইভাবে রাশিয়ার বিপ্লব ও চিন বিপ্লবের বিপর্যয় আগামী দিনের শ্রমিক শ্রেণির বিপ্লবের জন্য অসীম গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা রেখে গেছে যার সাহায্যে ভবিষ্যতে সমাজতন্ত্রে পুঁজিবাদ পুনঃপ্রবর্তনের অপচেষ্টা সময় মতো বুঝতে পারা যাবে এবং তা পরাস্ত করা সম্ভব হবে।

ঐতিহাসিক নভেম্বর বিপ্লবের ৯৮তম বার্ষিকী আমরা এমন একটা সময়ে উদযাপন করতে চলেছি যখন অভূতপূর্ব, লাগামছাড়া নির্মম পুঁজিবাদী শোষণে সমস্ত দেশের সাধারণ মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়েছে। অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজ ও বিশেষ করে সংস্কৃতি সহ জীবনের সমস্ত ক্ষেত্র সংকটের কালো মেঘে ঢাকা পড়েছে। অনিরসনীয় সংকটের কবলে পড়ে বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদ মৃত্যুশয্যায় ধুঁকছে।

অন্যদিকে সমস্ত উন্নত ও পিছিয়ে পড়া পুঁজিবাদী দেশগুলিতে সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত গণআন্দোলনে ফেটে পড়ছে। মানুষ হন্যে হয়ে বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন চাইছে। তারা স্লোগান তুলছে 'পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক', 'বিশ্বায়ন ধ্বংস হোক'। এর পরের ধাপের যে স্লোগানটি এখনও ওঠেনি, তা হল —'সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সফল হোক'। সমস্ত দেশেই বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত। এখন সবচেয়ে বেশি যা প্রয়োজন, তা হল বিপ্লবের প্রস্তুতি, অর্থাৎ লাগাতার শ্রেণি সংগ্রামগুলিকে যথার্থ পরিণতিতে পৌঁছে দেবার জন্য সর্বহারার বিপ্লবী দলকে শক্তিশালী করা এবং অন্যান্য দেশে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার ভিত্তিতে বিপ্লবী দল গঠন করা ও তাকে শক্তিশালী করা। এ ক্ষেত্রে সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ প্রতিষ্ঠিত এস ইউ সি আই (সি) দলকে শুধু এদেশেই নয়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও ইতিহাসনির্ধারিত দায়িত্ব পালন করে যেতে হবে।

আমাদের ভুলে যাওয়া ঠিক নয় যে, আগেকার অন্যান্য সমাজব্যবস্থার মতো সমাজতন্ত্রও এসেছিল সমাজবিকাশের অমোঘ নিয়ম মেনেই। সাময়িক ভাবে ব্যর্থ হলেও শেষ পর্যন্ত এই ব্যবস্থার বিজয় অবশ্যম্ভাবী।

ইতিহাসের এই শিক্ষা মনে রেখে আমরা নভেম্বর বিপ্লবের ৯৮তম বার্ষিকী পালন করব এবং প্রস্তুতি নেব ৭ নভেম্বর ২০১৬ থেকে ৭ নভেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত নভেম্বর বিপ্লবের শতবর্ষ উদযাপনের।

এ উচ্ছ্বাস কতটা স্বতঃস্ফূর্ত

তিনের পাতার পর

প্রসাধনী সামগ্রী, তার কোনওটা রোদের তাপ থেকে চামড়াকে রক্ষা করে, কোনওটা ব্যবহার করলে চেহারায় বাড়তি আকর্ষণ সৃষ্টি হয়, আবার কোনওটায় মুখমণ্ডল ঝলমলে করে তোলে। কয়েক মাস ধরে চলেছে স্মার্টফোনের কোম্পানিগুলির খবরের কাগজে এবং টিভিতে বিজ্ঞাপনের বন্যা। ফলে জীবনের অন্য ঘাটতিগুলি পূরণ হোক বা না হোক, আধুনিক ডিজাইনের ফোন তো পুজোয় একটা চাই-ই। কারও আবার লক্ষ্য পুজোতে একটা দু'চাকা কিংবা চারচাকার গাড়ি। কারও ফ্ল্যাট। আবার ফ্ল্যাট হাতে পেলেই তো হল না, তাকে তো সাজিয়ে তুলতে হবে। তার জন্যও পাতার পাতার পর পাতা বিজ্ঞাপন দিচ্ছে বিখ্যাত রঙ কোম্পানিগুলি, ইন্টিরিয়র ডেকোরেশনের কোম্পানিগুলি। টাকা ফেললে তারা সব কিছু সাজিয়ে দেবে একেবারে মনের মতো করে। এইভাবে রান্নার তেল থেকে মদের কোম্পানি, জুতো থেকে গয়নার কোম্পানি সকলে ঝাঁপিয়ে পড়ে পুজোর বাজার ধরতে।

কেউ বলতে পারেন, এ তো সচ্ছল মধ্যবিত্তদের কথা, কিন্তু যাদের নুন আনতে পান্তা ফুরোয় তাদের কি জাহাজের খবর রাখলে চলে! এটাই তো আসল ট্র্যাজেডি। পুঁজিবাদ তার পণ্য বিক্রির জন্য অক্লান্ত চেষ্টার মধ্য দিয়ে সমাজে যে ভোগবাদী মানসিকতা গড়ে তুলেছে, তার হাত থেকে দরিদ্ররেও কি রেহাই আছে! তাকেও পরিবারের সদস্যদের মান রাখতে এই 'আনন্দ যজ্ঞে' মাততে হয়, তাতে স্ত্রীর চিকিৎসা বন্ধ হোক কিংবা ঋণের পরিমাণ আরও খানিকটা বাড়ুক। বন্ধুর হাতে যে নতুন মোবাইল, পায়ে নতুন জুতো, গায়ে নতুন জামা— অতটা দামি না হলেও সস্তারও তো একটা তাদের দিতে হবে। সংসারে শান্তি বজায় রাখতে হবে তো!

অথচ মিডিয়া অহরহ প্রচার চালিয়ে পুজোর ঝলমলে দিকটিকেই গোটা সমাজের চিত্র বলে তুলে ধরে। বাস্তবে এটি গোটা সমাজের এক খণ্ডিত চিত্র মাত্র। এর বিপরীতে রয়েছে আর একটা জগৎ, যেখানে উৎসবের এই আলো পৌঁছায় না, থাকে অন্ধকারে ঢেকে। যেটাতে রয়েছে বন্ধ কারখানা, বন্ধ চা-বাগানের শ্রমিক, ফসলের দাম না পাওয়া চাষি, বেকার যুবক-যুবতী আর অতি নিম্ন আয়ের মানুষেরা— যাদের সংখ্যাটা বিপুল। মিডিয়ার ঝলমলে উৎসবের অবিরাম প্রচারের ফাঁক গলেই বেরিয়ে আসে একের পর এক কারখানা বন্ধ হওয়ার খবর, ফসলের দাম না পাওয়া চাষির আত্মঘাতী হওয়ার ঘটনা, সন্তানকে একটা নতুন পোশাক কিনে দিতে না পারার অক্ষমতার গ্লানিতে গৃহবধূর আত্মহত্যার ঘটনা। বেকার যুবক-যুবতীর হাহাকারের আওয়াজ অনেক সময় উৎসবের উচ্চকিত শব্দকেও ছাপিয়ে গিয়ে আঘাত করে মধ্যবিত্ত মননে। প্রশ্ন তুলে দেয়— উৎসবের এই উচ্ছ্বাস কতটা স্বতঃস্ফূর্ত, আর কতটা কৃত্রিম! অথচ প্রতিটি মানুষই উৎসবে সামিল হতে চায়। চায় সকলের জীবনই আনন্দে ভরে উঠুক। কিন্তু বাস্তবে তার উপায় আছে কই! মুনাফা-লোভী পুঁজিবাদী এই সমাজ ব্যবস্থা বেশিরভাগ মানুষের জীবন থেকে আনন্দ, শান্তি কেড়ে নিয়েছে। মূল্যবৃদ্ধি, বেকারি, ছাঁটাই, অনিশ্চয়তা তাদের জীবন জেরবার করে তুলেছে। উৎসবের কটা দিন মানুষ জীবনের সমস্যা-সংকটকে হয়ত ভুলে থাকে, কিন্তু উৎসব কাটলেই সেগুলি জীবনে আরও জাঁকিয়ে বসে। উৎসবের খেসারত মূল্যবৃদ্ধির আকারে কড়ায়-গণ্ডায় মিটিয়ে দিতে হয় জনতাকে। ব্যবসায়ীরা, কর্পোরেট হাউসগুলি তাদের স্পনসরশিপ-বিজ্ঞাপনের খরচ তুলে নেয় আরও মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়ে। একদিকে মূল্যবৃদ্ধি, অপরদিকে আয়ত্তের বাইরে ব্যয়, এই দুইয়ের চাপে সাধারণ মানুষ ছটফট করতে থাকে। কর্পোরেট হাউসগুলির খাতা ভরে ওঠে লাভের অঙ্কে।

আমতলা হাইস্কুলে অভিভাবক প্রতিনিধি নির্বাচনে বিপুল জয়

৪ অক্টোবর আমতলা মতিরাম হাইস্কুলে অভিভাবক প্রতিনিধি নির্বাচনে এস ইউ সি আই (সি) সমর্থিত ৬ জন প্রার্থী টিএমসি প্রার্থীদের হারিয়ে বিপুল ভোটে জয়লাভ করে। দলমত নির্বিশেষে এলাকার জনসাধারণের ঐকান্তিক সমর্থনে জয়যুক্ত হয়ে এস ইউ সি আই (সি) সমর্থিত অভিভাবক সমিতি দক্ষতার সাথে ১৯৬৫ সাল থেকেই এই স্কুল পরিচালনা করে আসছে। রাজ্যের অন্যান্য নির্বাচনের মতো এই নির্বাচনেও রাজ্যের শাসক দল জেতার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিল। প্রলোভন, সন্ত্রাস, বহিরাগতদের আনাগোনা, স্থানীয় বিধায়ক সহ শাসক দলের অন্যান্য নেতাদের হুঙ্কার কোনওটাই বাদ যায়নি। কিন্তু অতীতের সি পি এম, কংগ্রেসের মতো তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীরাও শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছেন।

হাওড়ায় শারদীয়া বুকস্টলে সমাজবিরোধীদের হামলা

১৯ অক্টোবর দেউলটি এবং ২০ অক্টোবর ঘোড়াঘাটা স্টেশনের কাছে এস ইউ সি আই (সি)-র বুকস্টলে রাতের অন্ধকারে হামলা চালায় একদল দুষ্কৃতী। দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে ২১ অক্টোবর পুলিশ সুপারের কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

বাংলাদেশে সুন্দরবন ধ্বংসকারী রামপাল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র বিরোধী আন্দোলনে পুলিশি হামলা

বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিবেশবাদী সংগঠন, পরিবেশ ও বন বিষয়ক বিশেষজ্ঞ এবং সর্বোপরি দেশের জনগণের সবরকম মতামত উপেক্ষা করে, হাজার হাজার পরিবারকে উচ্ছেদ করে, আবাদযোগ্য কৃষি জমি ধ্বংস করে একতরফাভাবে, গায়ের জোরে আওয়ামি লিগ সরকার সুন্দরবন লাগোয়া অঞ্চলে রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন করতে যাচ্ছে। দেশের ভবিষ্যৎ ভয়াবহ সংকট চিন্তা করে একে রুখতে গণতান্ত্রিক বামমোর্চা ১৬-১৮ অক্টোবর ঢাকা থেকে সুন্দরবন অভিমুখে রোডমার্চের কর্মসূচি নিয়েছিল। দেশের স্বার্থের সাথে জড়িত এমন একটি বিষয়ে গণতান্ত্রিক প্রচার-প্রচারণা ও জনমত গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত রোডমার্চে পুলিশ পদে পদে হামলা চালিয়ে, নেতা-কর্মীদের আহত করে, রোডমার্চকে পথে খাবার জন্য বাস থেকে নামতে না দিয়ে, পুরো রোডমার্চকারীদের এমনকি মেয়েদেরও বাথরুমে পর্যন্ত যেতে না দিয়ে বাসে আটকে রেখে দমন-পীড়নের এক নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত তৈরি করেছে।

রোডমার্চের পথে পুলিশের নির্মম আক্রমণ

রোডমার্চকারীদের একটাই উদ্দেশ্য ছিল, তা হল রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্রের ভয়াবহতা সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা এবং এর বিরুদ্ধে জনসচেতনতা গড়ে তোলা। এর বাইরে কোনও কিছু তারা করেননি। কিন্তু সেই গণতান্ত্রিক কর্মসূচিও রাষ্ট্র গায়ের জোরে দমন করতে চাইল।

প্রেসক্লাবের সামনে উদ্বোধনী সমাবেশ শুরু হয়। এদিন সকাল থেকেই একে একে মোর্চার শরিক পার্টিগুলো মিছিল সহকারে জড়ো হতে থাকে সেখানে। শিক্ষক-শিক্ষাবিদ-সাংবাদিক-বুদ্ধিজীবীরাও অনেকেই উপস্থিত হয়েছিলেন সংহতি জানাতে। উপস্থিত হয়েছিলেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক এবং তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির সদস্য সচিব আনু মুহাম্মদ ও বিশিষ্ট সাংবাদিক গবেষক সৈয়দ আবুল মকসুদ প্রমুখ।

উদ্বোধনী সমাবেশে বাসদ (মার্কসবাদী)-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী বলেন, 'আজ এমন এক সময়ে আমরা মিলিত হয়েছি যখন দেশ সমস্ত দিকে স্তব্ধ হয়ে আছে। দেশে সত্যিকারের কোনও গণআন্দোলন নেই। এই সময়ে গণতান্ত্রিক বামমোর্চা, দেশের বামপন্থীদের যতখানি শক্তি আছে তাকে ঐক্যবদ্ধ করে জনগণের কাছে আবেদন করছে সুন্দরবন ধ্বংসকারী এই ভয়ঙ্কর সমস্যাকে নিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য। ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদ ও বাংলাদেশের ফ্যাসিস্ট সরকার — এই দুই আগ্রাসী শক্তি মিলে দেশ ও দেশের সম্পদ ধ্বংস করার চেষ্টা করছে। এর বিরুদ্ধে যারা সত্যিকারের সংগ্রামী শক্তি, তারাই একত্রিত হয়েছে। সরকারের সাথে যে বামপন্থীরা আছে, তাদের সাধ্য নেই এই আন্দোলন করার। এই জোর নিয়ে আমরা এগোতে থাকি, যাতে এই আন্দোলনকে প্রতিরোধের আন্দোলনে নিয়ে যেতে পারি'।

উদ্বোধন শেষে একটি মিছিল রাজধানীর রাজপথ প্রদক্ষিণ করে যাত্রা করে মানিকগঞ্জ অভিমুখে। মানিকগঞ্জে শহিদ স্মৃতিস্তম্ভের সমাবেশ স্থলে গিয়ে মোর্চার নেতা-কর্মীরা হতবাক। পুলিশ ব্যানার ছিঁড়ে ফেলেছে। মাইক-চেয়ার সরিয়ে দিয়েছে। প্যান্ডেলটিও খুলে ফেলেছে। সমাবেশের অনুমতি দিয়েও সমাবেশ করতে না দেওয়ার সিদ্ধান্ত বর্তমান অনির্বাচিত অগণতান্ত্রিক সরকারের স্বৈরাচারী চরিত্রেরই বহিঃপ্রকাশ। সমাবেশ করতে না দেওয়ায় মোর্চার নেতৃবৃন্দ সিদ্ধান্ত নেন মিছিল করেই পরবর্তী গন্তব্যের দিকে রওয়ানা দেবে রোডমার্চ। তাতেও পুলিশ বাধা দেয় — মিছিলও করতে দেবে না। এই বাধার মুখেও মিছিল নিয়ে সামনে এগোতে চাইলে পুলিশ অতর্কিতে বেধড়ক লাঠিচার্জ করে, বন্দুকের বাঁট দিয়ে আঘাত করে মিছিল ছত্রভঙ্গ করে দেয়। হামলায় গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির সাধারণ সম্পাদক কমরেড মোশরেখা মিশু, বাসদ (মার্কসবাদী)-র কেন্দ্রীয় কার্য পরিচালনা কমিটির সদস্য কমরেড শুভ্রাংশু চক্রবর্তী ও ফকরুদ্দিন কবির আতিক সহ ২০-২৫ জন নেতা-কর্মী আহত হন। বেপরোয়া পুলিশ পাশের মাঠে ঢুকে আবার হামলা করতে উদ্যত হলে বাসদ (মার্কসবাদী)-র নেতা-কর্মীরা সহ রোডমার্চকারীরা সংগঠিত হয়ে রুখে দাঁড়ায়। প্রতিরোধের মুখে পুলিশ কিছুটা পিছু হটে।

ভূমি দস্যুরা এদেশের নদী-খাল দখল করছে, বন দখল করছে,সরকার তাদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নিতে পারছে না, অথচ যারা পরিবেশ রক্ষায় কাজ করছে পুলিশ হামলা করে তাদের জীবন বিপন্ন করছে। এটাই প্রমাণ করে দেশের স্বার্থ রক্ষা নয়, পরিবেশ রক্ষা নয় — সরকার স্বার্থ রক্ষা করছে ভূমিখেকো পুঁজিপতিদের-মালিকদের। এই পুঁজিপতিরাই তো দেশ পরিচালনা করছে। দেশের সম্পদ লুটে নিচ্ছে। নিজেদের সহযোগী হিসেবে বিদেশি সাম্রাজ্যবাদী বহুজাতিক কোম্পানিগুলোকে ডেকে আনছে। তারাই আজ মুনাফার অদম্য লালসায় গোটা বিশ্বের ঐতিহ্য, বিরল প্রাকৃতিক সম্পদ ও সৌন্দর্যের আধার, লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন ও জীবিকার উৎস সুন্দরবনকে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছে।

রাজবাড়ির গোয়ালন্দে এক নির্মীয়মান ভবনে রাত্রিযাপন শেষে পরদিন মিছিল করে মাগুরার উদ্দেশে রওয়ানা দেয় রোডমার্চ। মাগুরায় প্রবেশের পথে লড়াই ব্রিজের পাশে দাঁড়িয়ে বাসদ (মার্কসবাদী)-র স্থানীয় কর্মীরা রোডমার্চকে স্বাগত জানায়। বাস থেকে নেমে একটু অগ্রসর হতেই মিছিল আবার পুলিশি বাধার মুখে পড়ে। পুলিশ লাঠি পেটা শুরু করে। এতে মোর্চার সমন্বয়ক কমরেড সাইফুল হক সহ ১৮-২০ জন নেতা-কর্মী আহত হন। উপর্যুপরি পুলিশের এহেন ভূমিকায় ক্ষুব্ধ, দৃঢ়চিত্ত রোডমার্চকারীরা কাতারে কাতারে দাঁড়িয়ে যায় — পুলিশের হামলা ও বাধাকে উপেক্ষা করে মিছিল নিয়ে ঢাকা মোড় থেকে ভায়না মোড় পর্যন্ত যায়। পুলিশের পিকআপ ভ্যান পিছু নেয়। গাড়ি বহরের সামনে পেছনে পুলিশের পিকআপ ভ্যান কার্যত রোডমার্চকে কর্ডন করে যশোরের দিকে নিয়ে যায়। যশোরের টাউন হলে ছিল পূর্ব নির্ধারিত জনসভা ও রাত্রিযাপন। কিন্তু এখানে শহরেই ঢুকতে দেয়নি পুলিশ।

এতসব অনিশ্চয়তার মধ্যেই খুলনা শহরে প্রবেশ করে রোডমার্চ। পরদিন দুপুরে সেখান থেকে মিছিল করে শহিদ পার্কে সমাবেশে মিলিত হয় রোডমার্চ। অনেক চড়াই উৎরাই পেরিয়ে এবার সমাপনী সমাবেশের পালা। গন্তব্য বাগেরহাটের কাটাখালি মোড়। এখানেও দেখা গেল পুলিশের তৎপরতা। কিন্তু স্থানীয় জনগণের দৃঢ়তার কারণে সমাবেশ পণ্ড করার সাহস পায়নি। সমাপনী সমাবেশে কমরেড রণজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন কমরেড সাইফুল হক, জোনায়েদ সাকী, মোশরেফা মিশু, আব্দুস সাত্তার, হামিদুল হক ও শুভ্রাংশু চক্রবর্তী।

এই সমাবেশে কমরেড শুভ্রাংশু চক্রবর্তী বলেন, রামপাল কয়লা-বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ভয়াবহতা সম্পর্কে নতুন করে বলার কিছু নেই। তিনি বলেন, অনেকে প্রশ্ন করেন, আপনারা বামপন্থীরা সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন করছেন না কেন? আপনারা সবাই আলাদা আলাদা কেন? আমরা আপনাদের এই আকুতিকে সম্মান করি। আপনারা আন্দোলন চান, লড়াই চান। আর সে কারণেই আমরা বলি, আপনারা কি আমাদের এমন কোনও ঐক্যের মধ্যে যেতে বলবেন যে ঐক্য আন্দোলনকে ভেতর থেকে ধ্বংস করে দেবে? যারা সরকারের শরিক হয়ে জনগণকে শোষণ করার পাহারাদার হয়েছে, দেশের বুকে একটা ফ্যাসিস্ট শাসন কায়েমের শরিক হয়েছে — তাদের সাথে নিয়ে কীভাবে আন্দোলন করা সম্ভব? আমাদের কথা অত্যন্ত স্পষ্ট। আমরা আন্দোলন চাই, আন্দোলনের জন্য ঐক্য চাই। ঐক্যের কথা বলে আন্দোলনকে ধ্বংস করতে দিতে পারি না।

রোডমার্চের পথে পথে ছিল জনগণের আবেগভরা সমর্থন।

(বাসদ 'মার্কসবাদী'-র পত্রিকা 'সাম্যবাদ' বিশেষ বুলেটিন থেকে সংগৃহীত)

জীবনাবসান

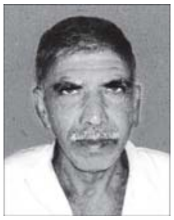

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার ক্যানিং থানার অন্তর্গত ইটখোলা লোকাল কমিটির অধীন ভেটকা কৃপাখালি গ্রামের পার্টির আবেদনকারী সদস্য কমরেড রুহুল আমিন গাজি ১৭ অক্টোবর হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৪ বছর। এস ইউ সি আই (সি) দলের বৈপ্লবিক আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ১৯৬৭ সালে তিনি ভাগচাষি উচ্ছেদ বিরোধী আন্দোলনে যুক্ত হন। তদানীন্তন কংগ্রেস সরকার ও পরবর্তীকালে সি পি এম ফ্রন্ট সরকারের পুলিশ বহুবার তাঁকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে জেলে পাঠিয়েছে, হয়রান করেছে। সি পি এমের আক্রমণে তিনি একাধিকবার ঘর ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু সমস্ত প্রতিকূল পরিস্থিতির বিরুদ্ধে তিনি দলের নেতৃত্বে লড়েছেন। অন্যায়ের সাথে কোনওভাবেই আপস করেননি।

তাঁর মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। তাঁর মরদেহে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান দলের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড বাদল সরদার, লোকাল সম্পাদক কমরেড আমিরুল সরদার ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। সহস্রাধিক মানুষ তাঁকে চোখের জলে বিদায় জানান। তাঁর মৃত্যুতে দল একজন সৎ, নিষ্ঠাবান ও লড়াকু সৈনিককে হারাল।

কমরেড রুহুল আমিন গাজি লাল সেলাম

ডক্টরেটরাও গ্রুপ ডি পদের দাবিদার

সংবাদে প্রকাশ, উত্তরপ্রদেশে ৩৬৮টি গ্রুপ ডি পদের সরকারি চাকরির জন্য ২৩ লক্ষ আবেদন জমা পড়েছে। আবেদনকারীদের মধ্যে অন্তত ২৫৫ জন ডক্টরেট ডিগ্রিধারী। অথচ ওই পদের যোগ্যতা প্রাথমিকের পাঠ শেষ করা ও বাইক চালাতে জানা। একই ছবি ছত্তিশগড়েরও। সেখানে সামান্য কয়েকটি সরকারি পদের জন্য আবেদনকারীর সংখ্যা ৭৫ হাজার। এই তথ্য দেশে ভয়াবহ বেকার সমস্যার খানিকটা ইঙ্গিত দেয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, তা যে রঙেরই হোক না কেন, নির্বাচনের আগে প্রতিশ্রুতি দেয় যে তারা ক্ষমতায় আসীন হলে বেকার সমস্যা দূর করবে। এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভারতের রাজ্যে রাজ্যে সর্বভারতীয় এবং আঞ্চলিক প্রভাবশালী প্রায় সব দলই ক্ষমতায় এসেছে। কিন্তু তারা যে সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হয়েছে এই তথ্য তারই প্রমাণ। কেন তারা ব্যর্থ হল? তারা কি আন্তরিকতার সাথে চেষ্টা করেনি, চাকরি দেওয়ার চেষ্টা তারা অনেকেই করেছে। অন্তত দলীয় কর্মীদের দেওয়ার জন্য তো করেছেই। তাতে মুষ্টিমেয় পেয়েছে, অধিকাংশই পায়নি। আসলে, সকলের জন্য কর্মসংস্থানের দরজা খুলে দিতে হলে শিল্পায়নের যে জোয়ার সৃষ্টি করা দরকার, তা পুঁজিবাদের বর্তমান সংকটের স্তরে করা সম্ভব নয়। তাই বেকারদের বুঝতে হবে যে, যতদিন পুঁজিবাদ থাকবে বেকার সমস্যা দূর করা কোনও সরকারের পক্ষেই সম্ভব নয়। শুধু তাই নয়, পুঁজিবাদের নিয়মেই সংকট যত বাড়বে বেকার সমস্যা তত তীব্রতর হবে। এই সমস্যার সমাধান সম্ভব একমাত্র সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায়। কারণ, সমাজতন্ত্রে উৎপাদনের সুফল সমস্ত শ্রমিকদের কাছেই বণ্টিত হয়। এর ফলে তাদের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ে, ক্রমাগত শিল্পায়নের ভিত্তি তৈরি হয়।

R.N.I. No 5268 / 60
P.R. No. KOL RMS / 138 / 2013-2015

অনশনকারী মাদ্রাসা শিক্ষকদের আন্দোলনের সমর্থনে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)

অনশনরত মাদ্রাসা শিক্ষকদের সমস্যাগুলি সমাধানের দাবি জানিয়ে এস ইউ সি আই (সি) বিধায়ক অধ্যাপক তরুণকান্তি নস্কর ২৮ অক্টোবর পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এক জরুরি চিঠি পাঠিয়েছেন। সেই চিঠিতে তিনি বলেছেন,

এ রাজ্যের ৪৯৫টি শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের (এস এস কে) শিক্ষকরা ১ অক্টোবর থেকে অনশন ধর্মঘট করছেন। তাঁদের মধ্যে শ্রীমতী ছন্দা সাহা অনশনরত অবস্থায় মারা গিয়েছেন। তাঁদের দাবি : এই মাদ্রাসাগুলিকে ওয়েস্ট বেঙ্গল মাদ্রাসা এডুকেশন বোর্ডের অধীনে আনা হোক, মাদ্রাসাগুলিতে যে লক্ষাধিক ছাত্র পড়াশোনা করছে তাদের জন্য পর্যাপ্ত সরকারি অনুদানের ব্যবস্থা করা হোক এবং শিক্ষকদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হোক। তাঁরা জানিয়েছেন, তাঁদের দাবিগুলি সাচার কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত। অবিলম্বে এগুলি মেনে নেওয়ার জন্য ঐ চিঠিতে ডঃ নস্কর মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দাবি জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য, এই মাদ্রাসাগুলিকে অনুমোদন দেওয়ার কথা মুখ্যমন্ত্রী ২০১৪ সালে ঘোষণা করেছিলেন। সেই সিদ্ধান্ত কার্যকর করার দাবিতেই এই অনশন আন্দোলনে নেমেছেন প্রায় পাঁচ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী।

ইতিপূর্বে ডঃ নস্কর ১৫ অক্টোবর কলকাতার হাজি মহম্মদ মহসীন স্কোয়ারের অনশনস্থলে গিয়ে এই আন্দোলনের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানান। পরে ২৬ অক্টোবর কমরেড তরুণকান্তি নস্কর এবং এস ইউ সি আই (সি) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড তপন রায়চৌধুরী পুনরায় অনশনস্থলে গিয়ে অনশনকারীদের সঙ্গে দেখা করেন।

নন-নেট ফেলোশিপ বন্ধের প্রতিবাদে ইউজিসি দপ্তরে বিক্ষোভ

সম্প্রতি ইউজিসি দেশ জুড়ে নন-নেট ফেলোশিপ বন্ধের এক নির্দেশিকা জারি করেও প্রবল প্রতিরোধের মুখে তা আপাতত প্রত্যাহার করে নেয়। কিন্তু একটি কমিটি গঠন করে ফেলোশিপ দেওয়ার ক্ষেত্রে নানা শর্তাবলী আরোপ করতে চাইছে। এমনিতে গবেষণা খাতে ক্রমশ আর্থিক বরাদ্দ কমিয়ে সরকার এই ক্ষেত্রটিকে সেল্ফ ফিনান্সিং করতে চাইছে, যা সার্বিকভাবে শিক্ষার বেসরকারিকরণের নীতিরই প্রয়োগ। প্রতিবাদে এ আই ডি এস ও, এস এফ আই সহ পাঁচটি বাম ছাত্র সংগঠনের পক্ষ থেকে ২ নভেম্বর সল্টলেকে ইউজিসির পূর্বাঞ্চলীয় অফিসের সামনে অবস্থানের ডাক দেওয়া হয়। অবস্থান মঞ্চ থেকে সমস্ত গবেষকদের শর্তহীন নিরবচ্ছিন্ন ফেলোশিপ দেওয়া, শিক্ষার বেসরকারিকরণ ও সাম্প্রদায়িকীকরণ বন্ধের দাবিতে এক প্রতিনিধি দল দপ্তরের আন্ডার সেক্রেটারিকে ডেপুটেশন দেয়।

নেতাদের দ্বিচারিতা প্রকাশ করে কোপে পড়লেন আর এস এস সদস্য

গোমাংস ভক্ষণ নিয়ে গোটা দেশে দাঙ্গা পরিস্থিতি তৈরি করে ফেলেছে বিজেপি এবং তার গুরু সংঘ পরিবার। গোমাংস নিয়ে যে কোনও গুজব তৈরি করে নিরীহ মানুষকে মেরে ফেলা হচ্ছে। কিন্তু বিষয়টা শুধু গোমাংসে সীমাবদ্ধ থাকছে না। হিন্দুত্ববাদীরা যে কোনও আমিষ খাদ্য নিয়েও ফতোয়া জারি করে দিচ্ছে। আমিষ ভোজন হিন্দু ধর্ম বিরোধী কাজ। এই প্রচার দেশের নানা প্রান্তে শুরু করেছে সংঘ নেতারা। তাদের প্রকাশিত সংবাদমাধ্যমে ফলাও করে এই নিয়ে প্রবন্ধ ছাপছে নাগপুরের নেতারা।

কিন্তু এই প্রচারে সম্প্রতি বাধ সেধেছে সংঘ পরিবারের ঘরের লোকই। দিলীপ দেওধর আর এস এস মুখপত্র 'তরুণ ভারত'-এর নিয়মিত কলম লেখক। আমিষ ভোজন হিন্দুধর্ম বিরোধী কাজ—সংঘ পত্রিকা 'পাঞ্চজন্য'-এর এই প্রচারকে সামনে রেখে একটি নামকরা ইংরেজি দৈনিক তাদের প্রবন্ধ ছাপে। সেখানে তারা দিলীপ দেওধরের একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশ করে। দেওধর সেখানে নির্দ্বিধায় সংঘ নেতাদের দ্বিচারিতা প্রকাশ করে দেন। তিনি বলেন, সংগঠনের শীর্ষপদে বসার আগে আর এস এস নেতাদের অনেকেই আমিষ খেতেন। বালাসাহেব দেওরস এবং মোহন ভাগবত রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের মাথায় বসার আগে পর্যন্ত আমিষ খাবার তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করতেন। সংবাদমাধ্যমকে এই বিস্ফোরক সংবাদ দেওয়ার জন্য হিন্দুত্ববাদী নেতারা এই সংঘ সদস্যের নামটুকু দলের খাতায় শুধু রেখেছে। বাকি সব কিছুই কেড়ে নিয়েছে। সংঘের সংবাদপত্র থেকে তার লেখা বাদ পড়ছে নিয়মিত। বাস্তবে কলম লেখক হিসাবে তিনি ব্রাত্য হয়ে গেছেন সংঘ নেতাদের কোপে।

এই সংবাদ ছাপার পর নাগপুরে সংঘের এক সভায় সংগঠনের পশ্চিম ক্ষেত্র প্রচারকদের মাথা রবীন্দ্র যোশির তিরস্কারের মুখে পড়েন দেওধর। বিষয়টি নিয়ে দেওধর নিজে জানিয়েছেন, 'আর এস এস নেতাদের দ্বিচারিতার আমি বিরোধী। আর এস এস আমিষ খাওয়ার বিরোধী নয়। সেই প্রসঙ্গেই আমি ওই নেতাদের খাদ্যাভ্যাস নিয়ে বলেছি। কিন্তু তারা এর জন্য আমার প্রবন্ধ ছাপা বন্ধ করে দিল।'

ইকনমিক টাইমস সংবাদপত্রের পক্ষ থেকে নাগপুর এডিশনের সম্পাদক তরুণ বিজয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি খবরটি সত্য বলে জানান।

সূত্র : ইকনমিক টাইমস, ৮ অক্টোবর, ২০১৫

শুধু মত দেওয়া নয়, আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে পাশ-ফেল চালু করতে হবে

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড সৌমেন বসু ২৪ অক্টোবর এক বিবৃতিতে বলেন, চার বছর ধরে আন্দোলনের চাপ থাকা সত্ত্বেও দীর্ঘ টালবাহানার পর অবশেষে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল চালু করার পক্ষে অভিমত জানিয়েছে। বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীদের নেতৃত্বে সেভ এডুকেশন কমিটি, ছাত্র সংগঠন এ আই ডিএসও এবং সর্বোপরি আমাদের দলের উদ্যোগে ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকদের দীর্ঘ আন্দোলনের ফলে গড়ে ওঠা ব্যাপক জনমতের চাপে রাজ্য সরকার দেরিতে হলেও এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছে। এজন্য আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী শিক্ষানুরাগী রাজ্যবাসীকে আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি। রাজ্যের পূর্বতন সিপিএম সরকার চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল তুলে দিলে সেই সময়েও আমরা আন্দোলন চালিয়েছি। ইতিপূর্বে ২০টি রাজ্য সরকার মত দেওয়া সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার পাশ-ফেল চালু করার ক্ষেত্রে নীরব থেকে শিক্ষার অপরিমেয় ক্ষতি সাধন করে চলেছে। আমরা দাবি জানাচ্ছি, জনমতকে স্বীকৃতি দিয়ে আর কালবিলম্ব না করে কেন্দ্রীয় সরকারকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল চালু করতে হবে। রাজ্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছি আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে এই রাজ্যে পাশ-ফেল প্রথা চালু করতে হবে।

ছত্তিশগড়ে আশা কর্মীরা আন্দোলনে

কাঁকের জেলার আশা কর্মীরা গত ১৮ মাস তাঁদের প্রাপ্য ভাতা পাননি। এর প্রতিবাদে এবং অন্যান্য ন্যায্য দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ১৩ অক্টোবর আশা কর্মীরা এক সমাবেশে মিলিত হন। সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন এ আই ইউ টি ইউ সি-র সর্বভারতীয় কমিটির সহ-সভাপতি এ এল গুপ্তা,

এস ইউ সি আই (সি)-র পক্ষে বিশ্বজিৎ হারোড়ে, আশা কর্মী প্রভাতী পাইক প্রমুখ। সীমা চক্রবর্তীকে সভাপতি এবং শরনা সরকারকে সম্পাদক নির্বাচিত করে একটি ব্লক স্তরের কমিটি গঠিত হয়। সম্মেলন শেষে মিছিল করে গিয়ে এস ডি এম-কে দাবিপত্র দেওয়া হয়।

সাম্প্রদায়িকতা ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যুক্ত বামপন্থী মিছিল

সাম্প্রদায়িকতা ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ছয় বামপন্থী দলের ডাকে ১৬ অক্টোবর একটি যুক্ত মিছিল ধর্মতলা থেকে কলেজ স্কোয়ার পর্যন্ত যায়

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই (সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন : সম্পাদকীয় দপ্তর : ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর : ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.sucicommunist.org